মনপ্রাণে স্বদেশেরি কল্যাণ সাধন
করিতেছে মৌনভাবে! যশোলিপ্সা, মান-অভিমান
তুচ্ছ করি,' অকাতরে দেছে বলিদান
আপনারে আর্ত্ত-শুভ আশে।
• • • আর আমি?
—সদা স্বীয় চিন্তামগ্ন স্বার্থ অনুগামী।"
পুনঃ সংবাদ আসিল—
• • "শঙ্কা নাহি আর
মাধবীর জীবনের।
• • তব তনয়ের
সাংঘাতিক পীড়া; নাহি আর জীবনের
আশা তা'র।"

অরবিন্দ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং আত্ম-গ্লানিতে ম্রিয়মান হইলেন। অজয় বলিলেন,—

"—হও কর্ম্মরত।
দূর কর হে সুহৃদ, স্বেচ্ছা-স্ফূর্ত্ত নিস্ফল আক্ষেপ,
হৃদয়ের ক্ষত মুখে কর্ম্মের প্রলেপ
দেহ লেপি',—নির্ব্বাপিত হবে জ্বালারাশি।"

অরবিন্দ বাড়ী ফিরিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য অতীব হৃদয়-বিদারক। মাধবীর কোলে নবজাত শিশুপুত্রটী মৃত্যু-মুখে পতিত। মাধবী ও অন্নপূর্ণার কাতরতায় পাষাণ হৃদয়ও গলিল। মাধবীকে অরবিন্দ এতদিনে চিনিল।

এতদিন অচেতন আছিলাম স্বপ্নমোহে;
তাই, রত্ন চিনি নাই!"

কবি বিষাদের চিত্র-অঙ্কণে সিদ্ধহস্ত। সমগ্র দৃশ্য-কাব্যে যেন একটী প্রকাণ্ড বিষাদের ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। শেষভাগে মাত্র এই বিষাদের ঘন-জাল অবিরল বারিবর্ষণ করিয়া ঝুটিয়া গেল। কিন্তু, শেষে যে সূর্য্যকিরণ বাহির হইল, তাহাতে নবীন অরুণের জীবন্ত উন্মাদনা নাই, কিন্তু মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তীব্র প্রখরতা নাই,—তাহা সান্ধ্য-গগনের স্নিগ্ধ জ্যোতি মাত্র।

কবির কল্পনায় অজয়ের মুখে ভগবানের যে পরিচয় পাই, তাহাতেও সেই নৈরাশ্য অঙ্কিত রহিয়াছে।

অর— • • • তবে কয়
কেন তাঁরে সবে দয়াময়?
অজ— ভ্রান্তি ইহা। আপন বিধানে
চির বদ্ধ তিনি। তাঁর প্রাণে
নাহি জাগে-তুচ্ছ চিন্তারাশি!
বিরাট্ চিন্তায় অবিনাশী,
চিরগুণ বিশ্বের কল্যাণ
জাগিতেছে। তিনি ন্যায়বান,
বিশ্বময়, মঙ্গল-নিদান;
'দয়াময়' ন'ন তিনি।

কি ভীষণ! তিনি দয়াময় ন'ন! "তিনি আপন বিধানে চিরবদ্ধ;" একারণ দয়া করিতে অসমর্থ। আর, যদি উপযুক্ত পাত্রে দয়া করাই ভগবৎ-বিধান হয়? জীব নিজ বুদ্ধিতে পাপে লিপ্ত হইয়া "আপনার কর্ম্মফল নিত্য করে ভোগ" সত্য, কিন্তু, যদি নিজ কৃত পাপের জন্য প্রকৃতই অনুতপ্ত হয়, তবে ভগবান তাহাকে কৃপা করেন—ইহাই যদি ভগবৎ-বিধান হয়, তবে কি তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিব? বর্ত্তমান দৃশ্যকাব্যে ঘটনাবলির সমাবেশে অরবিন্দের চরিত্র-সংস্কার, এতো ভগবৎ-প্রেমেরই উদাহরণ! Alastor কাব্যে মহাকবি Shellyর ন্যায় অরবিন্দের মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র এই মানব-জীবন
ভ্রান্তির তিমির তলে চিরদিন রহিয়া মগন,
নৈরাশ্য কুহেলি-জালে সংবৃত হইয়া
ক্রমে হায়—•

অসহ ক্লান্তির ভবে, কেহ নাহি জানে
গো কোথায়—
ডুবে যায় ধীরে।"

কিন্তু, Shellyর শেষ জীবনে তাঁহার নিরাশ হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। Shelly "Prometheus unbound"-এ যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, কবিবর দেবকুমার বাবু তাঁহার দেব-ভাষায় কবে আমাদিগকে তদ্রূপ আশার বাণী শুনাইবেন, তাহার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

"দেব-দূত দৃশ্য কাব্যখানি প্রাণস্পর্শী ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। আধুনিক যুগের Robert Browningএর কাব্যের ন্যায় ইহাতে কল্পনা-শক্তি ও প্রাকৃতিক বর্ণনার অতি সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে। ভাষা ভাবময়ী, ওজস্বিনী, বিচিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। রচনা ভাবানুগত ও শ্রুতি-মধুর।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবি—কবি দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তরোত্তর স্বীয় প্রতিভা বিস্তার করিয়া, জগতের মঙ্গল সাধন করুন।

পরিশিষ্ট।

সামান্য দুই একটী কথা—

(১) "ভালো" যেন চোখে কেমন লাগে, 'ভাল' লিখিলে দোষ কি?

(২) 'নিখিল' শব্দটী বিশেষণ, রবি বাবুর সময় হইতে পদটী বিশেষ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই কি ভাল?

(৩) রেফাক্রান্ত শব্দ বিকল্পে দ্বিত্ব হয় সত্য, কিন্তু "নির্য্যাস" ও "নির্য্যাতন" অপেক্ষা "নির্যাস" ও "নির্যাতন" দেখিতে ভাল লাগে।

শ্রীগণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

দুর্গাপূজা।

এই কি তোমার পূজারে ভাই এই কি তোমার পূজা?
কাদা মাটী দড়ী খড়ে,
প্রতিমা কি এমনি গড়ে,
দেবতারা পূজেছে কি এম্‌নি দশভুজা?
নিজের বীর্য্যে নিজের তেজে,
গড়িতে হয় তাহারে যে
সে একত্ব—আত্মশক্তি অনন্তা অযুজা।
এই কি তোমার পূজারে ভাই এই কি তোমার পূজা

২

এম্‌নি করে গড়ে না কি মায়ের মূর্ত্তি খানি?
এই কি শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা,
বিনা প্রাণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা,
শক্তি বিনা জাগে নাকি শক্তি শিবরাণী
দেবতারা আহ্লাদে,
প্রাণ দিয়েছে আপন প্রাণে
জেগেছে তাই জন্মভূমি জননী কল্যাণী।
এম্‌নি ক'রে গড়ে না কি মায়ের মূর্ত্তি খানি?

৩

এই কি রে মার বসন ভূষণ এই কি রে মার সাজ?
সর্ব্বভূতে যিনি লজ্জা,
মহৈশ্বর্য্য যাহার সজ্জা,
তার কি লজ্জা রক্ষা কর্ব্বে শালুর পেশোয়াজ?
তারে দিলি টিনের ঢাল,
টিনের শুল্‌পী তরোয়াল,
কেম্‌নে করলি এম্‌নিতর কাপুরুষের কায?
এই কি রে মার বসন ভূষণ এই কি রে মার সাজ?

৪

এই বেশে মা কর্ব্বে না কি মহিষাসুর বধ?
বৃথারে তোর কল্পারম্ভ—শরৎ প্রতিপদ।
মা নয় এ যে মাটীর ডেলা
পূজা নয় এ পুতুল খেলা

জননী মৃন্ময়ী মূর্ত্তি জন্ম জনপদ।
এই বেশে মা কর্ব্বে না কি মহিষাসুর বধ?

৮

দেবের মত এক হইয়া,
শক্তি গড়া শক্তি দিয়া,
হাতে দেরে ব্রহ্ম অস্ত্র বজ্র ইরম্মদ।
কর্ রে পূজা নিজে নিজে,
সে মাতৃকা মন্ত্র বীজে,
বিজয়িনী বিশ্বশক্তি, অধম অপসদ।
বধিতে নিশুম্ভ শুম্ভে
পূজ্ রে হৃদয় রক্ত-কুম্ভে,
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি অরুণ পূজ্ল যেমন পদ।
কররে মায়ের কল্পারম্ভ,
চূর্ণ হোক সে দৈত্য-দম্ভ,
পদ্ম পায়ে লুটুক মায়ের অসুর দুর্ম্মদ।
বাজারে ভাই বিজয় শঙ্খ,
হউক ভারত নিরাতঙ্ক,
নিঃশঙ্ক নির্ব্বিঘ্ন হউক শান্ত নিরাপদ।
বিজলীতে জ্বল্ছে অসি
নীল দানবের বক্ষে পশি,
রক্তে রাঙ্গা দেখ রে মায়ের রক্ত পদ্মপদ।
সঙ্গে বাণী আন্ছে বেদ,
ঘুচারে ভাই ভ্রাতৃ-ভেদ,
লক্ষ্মী আন্ছে লক্ষ লক্ষ সৌভাগ্য-সম্পদ।
আন্ছে চির ব্রহ্মচর্য্য,
সংযম—চির কৌমার্য্য,
দৈত্যজয়ী কার্ত্তিকেয় যুদ্ধবিশারদ।
সর্ব্বসিদ্ধি সফলতা,
সর্ব্ব অপরাজিতা,
আন্ছে সর্ব্ব অব্যর্থতা বদন দ্বিরদ।
দেখ্ রে মা কি অদ্ভুতা,
কি মহা ঐশ্বর্য্যযুতা,
কি মহা মহিমময়ী মূর্ত্তি মনোমদ।
আকাশ যেন পড়্ছে নুয়ে,
চরণে তার মাথা থুয়ে,
হীরক কিরীটে তাহার হাস্ছে নীল হ্রদ।
মৃদ্ গন্ধে তার গায়ের গন্ধে,
ছুটছে বাতাস নানান্ ছন্দে,
তমাল বনে দুল্ছে শ্যামার শ্যামল পরিচ্ছদ।
এই রূপে মার কর্ রে পূজা,
দিগ্ বিসারী শৈলভুজা,
অমর সম সমর মন্ত্রে চরণ কোকনদ।
এই বেশে মা কর্ব্বে হেসে মহিষাসুর বধ।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বায়ু পিত্তের দ্বন্দ্ব না আত্মপ্রচার?

বৈদ্য শাস্ত্রে মানবের দৈহিক ধাতু বা ধাত্ ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে :—যথা, বায়ু, পিত্ত ও কফের ধাত। দেহের সুস্থাবস্থায় ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। ইহারা সমঞ্জসীভূতাকারে দেহের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ভাবে (In latent form) অবস্থান করে। কিন্তু অসুস্থাবস্থায় এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, এবং ইহাদের বিরোধের ফল রোগের লক্ষণরূপে বাহিরেও প্রকাশ পায়। তখন দেখা যায়, কোন ব্যারামে কফের, কোনটাতে বায়ুর, কোনটীতে বা পিত্তের প্রকোপ বেশী। যখন প্রাগুক্ত ত্রিবিধ ধাতের দুইটীর প্রকোপই প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—অর্থাৎ একটীকে ছাড়াইয়া অন্যটী ঊর্দ্ধে উঠিতে চায়—যথা, কফ-পিত্তের দ্বন্দ্ব, বা কফ-বায়ুর দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি।

শারীরিক ব্যাধির ন্যায় মানসিক ব্যাধিতেও ঐরূপ ধাতু-বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দেহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ধাতুগত বায়ু, পিত্ত ও কফের আবাস-ভূমি সমগ্র দেহব্যাপী হইলেও সচরাচর তাহাদের

কার্য্য শরীরের যন্ত্র বিশেষকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। ফুসফুস্ কফের, যকৃত্ পিত্তের, এবং মস্তিষ্ক বায়ুর প্রধানতম লীলাক্ষেত্র বলিয়া কথিত। সম্পূর্ণরূপে এক প্রকারের না হইলেও, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেও ঈদৃশ ধাতের বর্ণনা রহিয়াছে :—যথা, Nervous, Bilious, and phlegmonous temperament, এবং মানসিক ব্যাধিতেও ইহা দেখা যায় যে, অন্ততঃ বায়ু মস্তিষ্ককে, এবং পিত্ত যকৃত্কে অবলম্বন করিয়াই আপন আপন কার্য্য করিতে সমর্থ। বায়ুর প্রকোপের লক্ষণ সমূহ সর্ব্ব-সাধারণের নিকট এতই সুপরিচিত যে, এই স্থলে সেগুলির বর্ণনা অনাবশ্যক। কিন্তু পিত্তের প্রকোপের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ গুলি এত সুবিদিত নাও হইতে পারে, মনে করিয়া, সেগুলির একটুকু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে দিতেছি। সচরাচর পিত্ত বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা যকৃত হইতেই উৎপন্ন হয়। কামলা ব্যারাম (Jaundice) একটা পিত্তজ ব্যাধি। এই কামলা ব্যারামে চোক্ পীতবর্ণ ধারণ করে, এবং তদ্রূপ চোক্ দ্বারা যাহা দেখা যায়, তাহাও পীতবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। গাত্র-কণ্ডূয়ন ইহার আরো একটী বিশেষ লক্ষণ। ঈদৃশ লক্ষণ সমূহ মানসিক বিকারেও দৃষ্ট হয়। কে না জানে যে, পাশ্চাত্য কবিগণ যকৃত্কেই হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও পরশ্রীকাতরতার আবাস স্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ? তাঁহাদের মতে চিন্তা, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি যেমন মস্তিষ্কের কার্য্য, এবং প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, মমতা যেমন হৃদয়ের কার্য্য; তদ্রূপ হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতিও যকৃত হইতেই উৎপন্ন। তবে একমাত্র প্রভেদ এই যে, যকৃতের সুস্থাবস্থায় কথিত মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলি বিকার প্রাপ্ত হয় না। অসুস্থাবস্থাতেই উহারা প্রবল হইয়া উঠে। এই লক্ষণ গুলির সঙ্গে কামলার গাত্র-কণ্ডূয়ন ও চোকের অস্বাভাবিক দর্শনের যে নিকট সম্পর্ক, পাঠকবর্গকে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? মানসিক ব্যাধিতে বায়ু পিত্তের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ফল যে কিরূপ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা, তাহাও সহজে অনুমেয়। পাঠকবর্গকে ইহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া আমি আমার মূল কর্ত্তব্য বিষয় তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয়-প্রণীত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া দুইখানি খোলাপত্রে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে যেরূপ তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন, ইহাতে যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। একজন সাধারণ সমাজ-ভুক্ত প্রকৃতিস্থ ব্রাহ্ম (যিনি নিজকে শাস্ত্রী মহাশয়ের পুরাতন শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন) যে তাঁহার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ও কদর্য্য আচরণ করিতে পারেন, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় ? তাই মনে সন্দেহ হইতেছে যে, খোলা পত্র দুইখানির লেখক হয়ত বা প্রকৃতিস্থ নহেন।

চণ্ডীবাবুর শরীর যে অনেক দিন হইতেই অসুস্থ, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। কিন্তু মনটাও তথৈবচ কিনা, ইহাই প্রশ্ন। তিনি সৎসাহসের দোহাই দিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি কতইনা বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন ! ইহা—অর্থাৎ গুরু-মারা বিদ্যাই যদি সৎসাহসের কার্য্য হয়, তবে অসৎসাহস ও ধৃষ্টতা কাহাকে বলা যায় ? তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণ

বিষাক্ত হইলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বর্ম্মাবৃত পুরুষের অঙ্গ যে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার একটা কেশকেও যে স্থানচ্যুত করিতে পারেনা, ইহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই রূপ সদাচার ও নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য কি সংসাহসের পরিচায়ক?

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কোন একটা সত্য গোপন করা হয় নাই বলিয়া চণ্ডীবাবু শাস্ত্রী মহাশয়কে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

স্বর্গীয় মহাপুরুষ কেশবচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের পরীক্ষা-বিষয়ক দুর্ঘটনাটী তাঁহার সহোদর প্রতিম প্রিয়বন্ধু পরলোকগত মনস্বী প্রতাপচন্দ্র স্বপ্রণীত ঐ মহাপুরুষের জীবন-চরিতে যখন বিবৃত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ঐ ঘটনাটীর উল্লেখ কি শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে বড়ই একটা অপরাধের বিষয় হইয়াছে? উহা গোপন করিলে কি এমন একটা সত্য গোপন করা হইত না, যাহার সহিত কেশবচন্দ্রের পরবর্ত্তী ধর্ম্ম জীবন-বিকাশের বিশেষ একটা সম্পর্ক সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে? শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় আরও অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাই মনে করেন না কি? আর সম্পর্ক না থাকিলেও ইতিহাসে সত্য গোপন করা হইলে তাহাকে কি নিরপেক্ষ ইতিহাস বলা যাইতে পারে? চণ্ডী বাবুর ন্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধি স্থিতি স্থাপক গুণ-বিশিষ্ট নয় বলিয়াই কি তিনি চণ্ডী বাবুর বিরাগভাজন হইয়াছেন?

চণ্ডী বাবু কি সত্য সত্যই মনে করেন যে, ধর্ম্মবীর কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের একটা সাময়িক দুর্ব্বলতার কথা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ জানিতে পারিলে, তাঁহার প্রতি তাহাদের যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিবে না? তাহা হইলে ইতিহাসে কুচ্‌বিহারে বিবাহ বিষয়ক গোলযোগের বর্ণনা তিনি কেমন করিয়া সমর্থন করিলেন? সেই গোলযোগে কি কেশবচন্দ্রের কোন দোষ ত্রুটী লক্ষিত হইয়াছিল না? এবং তুলনায় সেই দোষ ত্রুটী তাঁহার পরীক্ষাগারের দুর্ব্বলতা হইতে অল্প না অধিক?

এই স্থলে আরও একটা প্রশ্ন এই যে, হঠাৎ কেমন করিয়া কেশবচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার প্রতি চণ্ডীবাবুর এরূপ উৎকট প্রেমোদয় হইল। ইহা কি সত্য সত্যই প্রেমের অভিব্যক্তি, না ইহা একটা প্রেমের ভাণ? শাস্ত্রী মহাশয়কে গালি দিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই এই ভাণের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই ত? ইতিহাসের এক স্থলে যদি শাস্ত্রী মহাশয় কেশবচন্দ্রের প্রতি একটুকু অবিচারই করিয়া থাকেন, অন্য দশস্থলে আবার সুবিচার করা হয় নাই কি? কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মসমাজ যে সব সুমহৎ দানের জন্য ঋণী, ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় আর কোন্ ব্রাহ্ম প্রদর্শন করিয়াছেন? আর তাঁহার ন্যায় সাধারণ সমাজের অন্য কেহ কি তেমন করিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতি সংবিচার করিতে পারিয়াছেন? "মার চেয়ে বেশী ভালবাসেন মাসী" এ লৌকিক কথাটা কি চণ্ডীবাবু কখনও শুনেন নাই?

শাস্ত্রী মহাশয়-প্রণীত ইতিহাসে চণ্ডীবাবু কিছুমাত্র গুণ-ই দেখিতে পাইতেছেন না। কেবলই দোষ, কেবলই ত্রুটী তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে এই কথা বলিতে চাই যে, এই গুরুতর কঠিন কার্য্যে আপনি হাত না দিলেই ভাল করিতেন। আমার বিবেচনায় এই কাজটী সুসঙ্গত ও সুসম্পন্ন হয় নাই। সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন

ইতিহাস ইহাকে বলে না।" এবং দ্বিতীয় পত্রের প্রায় শেষ ভাগে দেখিতে পাওয়া যায় "আপনার ইতিহাসের রচনা-পদ্ধতি ও কর্য্যের বিচিত্রতা দর্শনে দুঃখিত হইয়াই, এ সকল কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।" পত্র দুইখানির অন্যান্য স্থানে এই ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার নমুনা নিম্নে দিতেছি :—

"আজ কালকার দিনে ইহাই যদি ইতিহাস নামের যোগ্য হয়, আর তাহাই আবার আপনার ন্যায় বিদ্বান সাধুপুরুষের লেখনীর ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা মৃত বা অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিবেচনায় ত্বরা এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত ছিল।" আবার,—"কেশবচন্দ্রের দীক্ষা গ্রহণের অন্তরালে যে একটা অনন্যসাধারণ গুণপনার পরিচয় বিদ্যমান, তাহাও কি লক্ষ্য করেন নাই ? তবে ইতিহাস লেখা কেন ?"

এই প্রকারের আর কত উক্তি উদ্ধৃত করিব ? এই সমস্ত উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে কি ইহাই দেখা যায় না যে, চণ্ডীবাবুর মতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে কেবল তাঁহার নিজের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন,তাহা নহে, তৎসঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও তিনি টানিয়া নীচে নামাইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জীবিত, সুস্থ ও সবল থাকিলে কখনই তিনি এরূপ কার্য্য করিয়া নিস্তার পাইতেন না। এস্থলে চণ্ডীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আর কি অধিকতর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হইত ? ইতিহাস প্রণয়নে তাঁহার কিম্বা তাঁহার ন্যায় কোন বিজ্ঞ লোক হইতে সহায়তা ও উপদেশ লওয়া হয় নাই কেন, ইহাও শাস্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে চণ্ডীবাবুর একটা বিশেষ অভিযোগ। তিনি বলেন, "কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমার ও অন্য অনেকের অভিজ্ঞতা আপনার অপেক্ষা অল্প নহে।" বটে ? চণ্ডীবাবু কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কি কি পরিচয় দিয়াছেন ? তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহার প্রণীত স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস ; তাহা হইলে তিনি নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ব্যক্তি বিশেষের জীবনী ও একটা সমাজ বা দেশের ইতিহাস যে একই কথা নহে, ইহা একজন স্কুলের বালকও জানে। আর ইহাও কি বলিতে পারা যায় না যে, ঐ জীবনীখানি সুন্দর হইয়া থাকিলেও উহা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রবাবু-প্রণীত পরলোকগত মাইকেল মধুসূদনের জীবনীর অনুকরণেই রচিত। এরূপ রচনা-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক যোগীন্দ্রবাবুই, তিনি নহেন। বাস্তবিক আলোচ্য পত্র দু'খানি আমিত্বে এতই পূর্ণ যে, উহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদিত হয়,ইহা কি বায়ু পিত্তের দ্বন্দ্ব, না আত্মপ্রচার ?

ইহার আরও একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি। তিনি বলেন, "আপনার মত আমরা অনেকেই কেবল ধর্ম্মলাভের জন্য এবং সেই ধর্ম্ম-জাত উন্নত সামাজিক জীবন ধারণ করিয়া ধন্য হইব বলিয়াই ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছিলাম। কিন্তু, হায়! আজ গভীর মনস্তাপের সহিত বলিতে হইতেছে, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পদ।

ধর্ম্ম-সমাজ বলিয়া, "সোণার পাথর বাটী" কোন দিন কোন দেশে হয় নাই, হইতে পারে না, ধর্ম্মের নামে দল হয়"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হায়! শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষে ধর্ম্ম ও উন্নত সামাজিক জীবনান্বেষী চণ্ডী বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গের কি ঘোর মনস্তাপ। কি গভীর নিরাশা। অথচ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন "আপনার সেই জ্বলন্ত নিষ্ঠাই আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথে চালিত ও কর্ম্মানুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। তাই বলিতেছি—আমি এক আমার মত অনেকেই, আপনার প্রথম বয়সের প্রথম কার্য্যক্ষেত্রের ফল, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বলা বাহুল্য যে, এই শেষোক্ত উক্তিটী চণ্ডীবাবুর পত্রের ভূমিকান্তর্গত। এখানকার বিনয় ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস দর্শনে, আমার ছেলেবেলার একটী বালক প্রতিবাসীর একটা অদ্ভুত কাণ্ডের কথা মনে পড়িল। বালকটী একদিন একটা আমল্‌কী বৃক্ষের ফল দেখিয়া লোভাবিষ্ট হয়, এবং উহা পাড়িবার জন্য গাছের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পায় যে, ঐ গাছের গুড়ি-সংলগ্ন ভূমিতে, পূজার পরে পরিত্যক্ত কতকগুলি মাটীর শিব পড়িয়া রহিয়াছে। সে গুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গাছে উঠিয়া আমলকী পাড়িতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। তাই ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া,—প্রথমে শিবগুলিকে একটা প্রণাম করিয়া, তৎপরে গাছে চড়া কার্য্যটা সে সম্পাদন করিল।

চণ্ডীবাবুও ঠিক এইরূপ একটা আচরণই করেন নাই কি? ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রদর্শন করিয়া পরে পত্র মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়কে যেরূপ অপদস্থ করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন, সমগ্র পত্র পাঠ না করিলে সকলে তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন কিনা, বলা যায় না। চণ্ডীবাবু ইহাই সকলকে বুঝাইতে চান যে,এক সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ নিষ্ঠাবান, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মানুরাগী ছিলেন, ইদানীং আর তিনি তেমনটা নাই। এখন তিনি সাধারণ-সমাজের দলপতি সাজিয়া, অকর্ম্মণ্য তোষামোদকারী ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, এবং তাহাদের দ্বারাই চালিত হইয়া এমন সকল কুকর্ম্ম করিতেছেন, যাহাতে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নত নীতি আর স্থান পাইতেছে না। তাই তিনি একটা স্বতন্ত্র নূতন সমাজ গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। তাঁহার নিজের ভাষাতেই তাঁহার মন্তব্যটা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—"যে কারণে কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল, আর তখন সমাজে যে শক্তি ছিল, আজ তদনুরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও সে উচ্চ আদর্শ সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাই সমাজের লোক বুঝিয়াও নীরব।" ভাল, চণ্ডীবাবুর আদর্শটা খুব উচ্চেইতো রহিয়াছে, এবং তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যেরও কোন অভাব দেখিতেছি না। এরূপ অবস্থায় তিনিই কেন একটা নূতন সমাজ গঠনের চেষ্টা করিয়া দেখুন না? এখানে আবার এইপ্রশ্ন মনে হইতেছে যে, ইহা কি বায়ু পিত্তের দ্বন্দ্ব না আত্মপ্রচার?

আমি ইহা বলিতেছি না, ভূমিকা ছাড়া সমালোচনার অন্যত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের কোনই প্রশংসাবাদ নাই। তা আছে বৈ কি? কিন্তু দেখা যায়, তার প্রত্যেক স্থলের অন্তেই একটা "কিন্তু" রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কুৎসাকে অধিকতর কুৎসিত করিবার জন্যই কি এই প্রশংসাবাদ?

ইহাও বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, ইতিহাসের অভাবাত্মক যে প্রশ্নগুলি চণ্ডীবাবু তাঁহার পত্রে উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই অসার বা বিবেচনার অযোগ্য। কিন্তু যেমন অসংযত ও অশিষ্ট ভাষাতে সেগুলিকে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বড়ই আপত্তিকর। ইতিহাসের ৩য় খণ্ড ত আজও প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে ঐগুলির সম্যক আলোচনা থাকিবে না, ইহা চণ্ডীবাবু কি করিয়া জানেন? তৃতীয় খণ্ড বাহির হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র ইতিহাসটা সম্বন্ধে তিনি এরূপ তীব্র মন্তব্য কেমন করিয়া প্রকাশ করিলেন? তাঁহার এই ঐকান্তিক ত্বরায় কি ইহাই প্রতীয়মান হয় না যে, পাছে শাস্ত্রী মহাশয়কে নির্য্যাতন করিবার সুযোগ তিনি হারান, এই আশঙ্কাতেই তিনি বিচলিত৷ বক্তব্য বিষয়গুলি গোপনে শাস্ত্রী মহাশয়কে না জানাইয়া প্রকাশ্য পত্রিকার আশ্রয় কেন তিনি গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্নের যে একটা লম্বা কৈফিয়ত তিনি দিয়াছেন, তাহা এতই অদ্ভুত যে, তাহার ল্যাজ কোন্‌টা, মাথাইবা কোন্‌টা, তাহা চিনিয়া উঠা দুষ্কর। কৈফিয়তের যুক্তিটা এতই সূক্ষ্ম যে, তাহার বিদ্যমানতা অনুভব করা অন্যের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। বস্তুতঃ তিনি "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাহিয়াছেন—তাহাও আবার বিকৃত কণ্ঠে। আর আজ কাল শাস্ত্রী মহাশয়ের যদি এরূপ দুর্ম্মতিই ঘটিয়া থাকে যে, তাঁহার নিজের বা ব্রাহ্মসমাজের উপকারের জন্য, কেহ তাঁহাকে বন্ধুভাবে কোন কথা বলিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন না, তাহা হইলে প্রকাশ্য পত্রিকাতে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কিম্বা কোন প্রকার ভয় দেখাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা সম্ভবপর কি? চণ্ডীবাবু কি নিজকে এতই সেয়ানা এবং তাঁহার পাঠকবর্গকে এতই আহাম্মুক বিবেচনা করেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যাহা গিলাইতে চান, তাহাই তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবে? এরূপাবস্থায় তাঁহার এই ব্যর্থ আস্ফালনকে বায়ু পিত্তের দ্বন্দ্ব কিম্বা আত্মপ্রচারের দুরাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কি মনে করা যাইতে পারে? তা যাহাই হোক্‌, উপসংহারে তাঁহাকে সেকস্‌পীয়রের একটী অমূল্য উক্তি শুনাইয়া, তাঁহার ও পাঠকবর্গের নিকট হইতে অদ্যকার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি। উক্তিটী এই :—

"Good name in man and woman, dear my Lord,
Is the immediate jewel of their souls.
Who steals my purse steals trash,
'tis Something, nothing ,
'T was mine, 't is his, and has been slave to thousands ,
But that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches
. . . him
And makes me poor indeed"

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়।

সাধারণ জ্ঞান Vs বিজ্ঞান।

নব্যভারতের ভাদ্র সংখ্যায় (১৩১৯) শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের লিখিত "লোকশিক্ষা" সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

"জাতক পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের বহু পুরুষের ধাতু লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেহ ও মন উভয়েই সে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়।"

"অতিশয় অর্থশালী হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনি অমঙ্গল-জনক।"

"নিরক্ষর ও শিক্ষিতগণের সংখ্যার অনুপাতে নিরক্ষর অপরাধী কম। দুর্নীতির উপর শিক্ষার প্রভাব অতি কম।"

"অতি নিম্নশ্রেণীর প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি হইতে তিনটী উৎকৃষ্ট অপত্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উত্তম শ্রেণীর ৩৫ জন ব্যক্তি হইতেই উহার দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট অপত্য উৎপন্ন হয়। উচ্চশ্রেণীর অর্থে উচ্চ বংশ এবং সদ্গুণ-সম্পন্ন।"

"আমরা দেখিলাম, শিক্ষা সদ্ভাব ও সচ্চরিত্র গঠন করিতে নিতান্তই অক্ষম, বংশ সং-শোধন না হইলে দুর্নীতি নিবৃত্ত হয় না।"

"আমাদের দেশীয় নিরক্ষরগণ প্রকৃতই চরিত্রবান্ ছিল। তাহারা যে সকল উপায়ে পৃথিবীর নিরক্ষরগণের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। সে ফল স্কুলে হয় না, সমাজ হইতে গড়িয়া উঠে।"

উল্লিখিত পরস্পর-বিরোধী এবং ভ্রান্তমত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা কঠিন। আভিজাত্য মূলতঃ দুইটী কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, বিদ্যা ও ধন। কিন্তু শশধর বাবুর মতে বিদ্যা ও ধন, উভয়েই অনিষ্টকারী এবং উহার কুফলও বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়।

আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, উচ্চ বংশ-জাত ব্যক্তি কুগুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং নিম্নশ্রেণী-জাত (নিরক্ষর ও দরিদ্র) ব্যক্তি সদগুণের অধিকারী হয়। আমরা কেহ সদগুণ-সম্পন্ন না হইলে আমাদের বংশধরগণকে কি শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অসম্মত হইব? কোন জাতক সম্পূর্ণ সু বা সম্পূর্ণ কু উপাদান লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না।

মহামতি গোখলে সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া শশধর বাবু যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা তাহার ভ্রম প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

গোখলে সাহেবের পাণ্ডুলিপি নিম্ন শ্রেণীর অর্থাৎ নিরক্ষর ও দরিদ্রগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। "দুর্নীতির উপর শিক্ষার প্রভাব বিস্তার" তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং ইহাতে শশধর বাবুর প্রতিবাদের কোন কারণ দেখি না। যেহেতু শশধর বাবুর মতে উচ্চ শ্রেণী অর্থে "সদ্গুণ ও সদ্বংশসম্পন্ন"। নিম্ন শ্রেণী তাহার বিপরীত, বুঝিতে হইবে। নিরক্ষর ও দরিদ্রগণের মধ্যে সদ্গুণ-সম্পন্ন ও সদ্বংশ-জাত হওয়া অসম্ভব নহে। তিনিই লিখিতেছেন, "বরং অশিক্ষিত লোকমধ্যে ঐক্যবন্ধন সহজে হয়, কিন্তু শিক্ষিত অল্পই হউক অধিকই হউক, শিক্ষিতগণের মধ্যে ঐক্য বড়ই দুর্লভ পদার্থ। মূর্খকে এক ডাকেই লাঠী সহ বাহির করা যায়, কিন্তু দশজন শিক্ষিতকে এরূপ করা যায় না।" "আমাদের দেশীয় নিরক্ষরগণ প্রকৃতই চরিত্রবান ছিল।"

বর্ণজ্ঞানলাভে এই সকল সদ্গুণ-সম্পন্ন নিরক্ষর শ্রেণীর কোন অমঙ্গলের কারণ দেখি না। শশধর বাবু সদ্বংশ অর্থে কি বুঝিয়াছেন? বংশেকি কি গুণ থাকিলে উহাকে সদবংশ বলা যায়? বিদ্যা ও অর্থ দ্বারাই সদ-

বংশত্ব লাভ হয়। বঙ্গীয় কায়স্থ সম্প্রদায় কি বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণের ন্যায় উন্নত নহে?

"আমরা দেখিলাম, লোক শিক্ষা আবশ্যক কিন্তু স্কুলের শিক্ষা নহে।"

বর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে কি উচ্চ শিক্ষা লাভ সহজ?

"বরং অশিক্ষিত লোক মধ্যে ঐক্যবন্ধন সহজ হয়, কিন্তু অল্পই হউক, অধিকই হউক, শিক্ষিতগণের মধ্যে ঐক্য বড়ই দুর্লভ পদার্থ" ইত্যাদি।

মূর্খতার এত প্রশংসা আর কখনও শুনি নাই। শশধর বাবু কি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ইহা কার্য্যত বিশ্বাস করেন? প্রেম হইতেই একতা জন্মে এবং প্রেম হৃদয়ের একটী উচ্চবৃত্তি। উহা নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষা-সাপেক্ষ। ভারতবাসী বিদ্যা বুদ্ধিতে ইংরাজ অপেক্ষা হীন, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভারতবাসী একতায় ইংরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? বিদ্যা দ্বারা শক্তি লাভ এবং শক্তি দ্বারা সাহস লাভ হইয়া থাকে।

"বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট স্কুলের শিক্ষার এই ফল। ইহাতে লোককে ইতস্ততঃ-পরায়ণ করিয়া তুলে, দ্বিধা, সন্দেহ, তর্ক এই সকল ক্রমেই বাড়াইয়া তুলে।"

দ্বিধা, সন্দেহ, তর্ক অধিকাংশ স্থলেই মঙ্গল-জনক। একেবারে সন্দেহশূন্য হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব।

"আমরা পূর্ব্বে যে অবস্থায় তৃপ্ত ছিলাম, এখন সেই অবস্থায় তৃপ্ত থাকি না।"

সদানন্দ হইয়া বিরাজ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। অসন্তোষই উন্নতির মূল কারণ। মানুষ হইলে তাহার অভাব থাকিবে, উদ্দেশ্য থাকিবে এবং কর্ম্ম থাকিবে। শারীরিক ও মানসিক জড়তা একপ্রকার মৃত্যু।

"সাধারণকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় না, অন্ততঃ বর্ণমালার সাহায্যে স্কুলে কখনও তাহা দেওয়া সম্ভব নহে।"

বর্ণজ্ঞান-মূলক শিক্ষার প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? গোখলে সাহেবের পাণ্ডুলিপি সাধারণে উচ্চশিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় নাই।

'ইউরোপে ও আমেরিকাতে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত কয়েদীর সংখ্যা এবং শিক্ষিত বিকৃত মানব সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।"

কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সর্ব্বদা এরূপ অনুমান করা যায় না। এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা আইনত দণ্ডনীয় হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা অন্যায় কার্য্য নহে।

শরীরে শক্তি থাকিলে কু ও সু উভয়ই সম্ভবপর।

"আমাদের দেশের নিরক্ষরগণ প্রকৃতই চরিত্রবান ছিল। তাহারা যে সকল উপায়ে পৃথিবীর নিরক্ষরগণের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। সে ফল স্কুলে হয় না, সমাজ হইতে গড়িয়া উঠে।"

আমরা ত জানি, ভারতের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ জ্ঞানের অভাব। স্কুল কি সমাজ হইতে ভিন্ন? আমরা আমাদের নিরক্ষরগণের "সর্ব্বজন-বিদিত" মহদ্‌চরিত্রের বিষয় কিছুই জানি না। কোন কোন নিরক্ষর-ব্যক্তির বংশানুক্রমের নিয়মে সচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। সর্ব্বদেশে উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা কম। জ্ঞানের বিস্তারেই সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ। "Man is a product of heredity and environment The man is largely what environ-

ment has already made him." ইহাই বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত।

"আমরা দেখিলাম, লোক-শিক্ষা আবশ্যক, কিন্তু স্কুলের শিক্ষা নহে।"

স্কুলের শিক্ষার অনিষ্টকারিতা কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য সভ্যদেশে যাহা মঙ্গলকর, লোকমত তাহা সমর্থন করিয়া সমাজে পরিচালন করিতে যত্নবান হয়। আমাদের দেশে তাহাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বর্ণজ্ঞান না থাকিলে বিপদের সংখ্যা আরও বাড়িবে।

"আমরা দেখিলাম যে, শিক্ষা সদ্ভাব ও সচ্চরিত্র গঠন করিতে নিতান্তই অক্ষম।"

বংশ সংশোধন না হইলে দুর্নীতি নিবৃত্ত হয় না। বংশসংশোধন কি উপায়ে হয়? জ্ঞানই কি মূল কারণ নহে? সদ্গুণ নিশ্চয়ই আকাশ হইতে পড়ে না। উহা বহুপুরুষের শিক্ষালব্ধ।

"অবশেষে দেখা গেল যে, নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলে অত্যল্প অংশকে উন্নত করা অসম্ভব না হইলেও মোটের উপর সমাজে যোগ্যতার পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায় এবং সমাজ মোটের উপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

ইহার তুল্য ভ্রান্ত ও অনিষ্টকারী মত আর কিছুই হইতে পারে না। সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য, নিম্নশ্রেণীকে জ্ঞান দ্বারা উন্নত করিয়া সাম্য ভাবে গ্রহণ করা। সমাজ 'জবর দস্তি' দ্বারা অনেক মঙ্গলকর কার্য্য সাধন করিতেছে. স্কুল-শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার অন্যথা কেন? বিলাত ও আমেরিকায় অনেক নিম্ন শ্রেণীর পতিত শিশু শিক্ষা দ্বারা উন্নত হইয়া সমাজে কৃতী পুরুষ হইয়াছে। মডার্ণ রিভিউ ও অন্যান্য পুস্তকাদিতে এই সম্বন্ধে বহু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচারই নিম্ন শ্রেণীর অধঃপতনের কারণ। শশধর বাবু নিম্ন শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর অর্থ—অসংলগ্ন ভাবে, ভিন্ন স্থানে ভিন্নার্থে ব্যবহার করিয়া বড়ই গোল বাধাইয়াছেন।

মহামতি গোখলের বিল কখনই "অসদ্গুণ-সম্পন্ন অসদ্ বংশের" মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় নাই। শশধর বাবুর এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সমর্থন করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীকে বর্ণজ্ঞান-মূলক শিক্ষা দ্বারা উন্নত করিলে তাহাদিগকে অবাধে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করা কঠিন হইবে।

সহজ জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হওয়া সকল সময় মঙ্গলজনক নহে। মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শশধর বাবুর ন্যায় বিজ্ঞের প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কর্ত্তব্য বোধে করিতে বাধ্য হইলাম।

"আমি বিতণ্ডা করিতে উপস্থিত হই নাই। কেবল বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক মতের একটু আভাস দিলাম মাত্র।"

শশধর বাবুর ন্যায় বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে এরূপ অবৈজ্ঞানিকতার আভাস পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রামমোহন রায়ের সংস্কার-প্রণালী।

শিরোনামাঙ্কিত বিষয়ে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের "দেবালয়ে" একটী সমালোচনা বাহির হইয়াছে। এরূপ আলোচনার যে স্থান রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু এরূপ আলোচনায় যতটা ধীরতার প্রয়োজন, তাহা সব সময়ে না দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। সমালোচনার বিষয়গুলি ধীরভাবেই উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলিও ঠিক সেইরূপ ধীরভাবেই করা হইয়াছে, ইহা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, সিদ্ধান্ত স্থানে স্থানে প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। কোথায়ও বা প্রমাণের বিপরীত দিকেই গমন করিয়াছে। যেন কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্যই মনে একটা তাড়া রহিয়াছে, সেই তাড়াই যেন লেখককে অলক্ষিতে টানিয়া লইতেছে; প্রমাণের গাড়ীতে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার সহিষ্ণুতা যেন লেখকের নাই বলিয়া মনে হইতেছে। গাড়ী তাঁহাকে যেস্থানে লইয়া যাইবে, তাহার জন্য যেন তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অথবা সেরূপ শিক্ষাই তাঁহার নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

লেখক বুঝাইতে চান যে, রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে চাহিয়াছেন। এই মত কতদূর সত্য, তাহা পরে বিবেচ্য। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, রাজার পতকাবাহী পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ রাজার প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি কি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, এখন তাহারই বিচার করা যাক্। তিনি Indian Messenger হইতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের একটা মন্তব্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই মন্তব্যটী সমাজ-সংস্কার বিষয়ে লিখিত হয় নাই, সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় আসিয়াছে। সুতরাং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে ইহাকে টানিয়া আনায় লেখকের স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণের জন্য একটা স্বাভাবিক উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দার্শনিক সত্য নির্ণয়ে authorityর স্থান, আর শাস্ত্রবাদীর নিকটে কোনও পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য শাস্ত্রের দোহাই, এই দুই এর মধ্যে যদি সমালোচক কোন বিভিন্নতা দেখিয়া না থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সিদ্ধান্তের আলোক আগে হইতেই তাঁহার দৃষ্টি শক্তিকে ঝলসাইয়া রাখিয়াছে। অথবা দার্শনিক আলোচনার শক্তিই তাঁহার জন্মে নাই। তারপর Philosophy of Brahmoism এবং History of the Brahma Samaj হইতে নিজে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তিনি কিরূপ সমাজ-সংস্কার-প্রণালীর পক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়াই পাইতেছি না। ইঁহারা বলিতেছেন, যে সময়ে ব্যক্তিগত জীবন বা সমাজকে পুনর্গঠন করিবার জলন্ত উৎসাহ ছিল না। ইহাতে প্রণালীর কথা আদৌ আসিতেছে কি? সংস্কার-প্রণালীর নয়, কিন্তু কার্য্য-তালিকার কথা হইতেছে।

একই প্রণালীতে কার্য্য করিতে যাইয়া একজন জলন্ত উৎসাহে কাজ করিতে পারে, একজন ধীরভাবে ধীরভাবে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাতে প্রণালীর বিভিন্নতা সূচিত হয় না। এই সব উক্তির অর্থ এই, রামমোহন যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন পরবর্ত্তী সময়ে তাহা অপেক্ষা আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছি, অথবা রামমোহনের যতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, তিনি ততদূর অগ্রসর হন নাই। ইঁহারা এ বিষয়ে অবিচার করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা এখানে বিচার করিব না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ব্রাহ্ম সমাজের দিক্ হইতেও ইঁহাদের উক্তি অপ্রতিবাদে গৃহীত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু সমালোচক মহাশয় যে নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্ততঃ এটা নিঃসন্দেহ যে, তিনি সিদ্ধান্তের অনুযায়ী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সিদ্ধান্ত আগে, প্রমাণ পরে কি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রণালী?"

এখন দেখা যাক্, রামমোহনের সংস্কার-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি কি রূপ "সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সমালোচনা পাঠ করিলে, ইহাই মনে হয়, রাজার যেন সংস্কার কার্য্যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্ভর ছাড়া অন্য পথ ছিল না। ইহা যেমন তাঁহার একদিকের ভ্রান্তি, অন্যদিকে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সংস্কারগণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিবেক বুদ্ধিকেই সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, ইহা অন্যদিকে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও আভ্যন্তরীণ বিবর্ত্তন বিষয়ে অনভিজ্ঞতার ফল। ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজই দেশে শাস্ত্রালোচনা প্রচার করিয়াছেন, হিন্দুর মুখ্য শাস্ত্রসকল ব্রাহ্মসমাজই প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে শাস্ত্র বিবেক বুদ্ধির বিপরীত দিকে যায় না, সেখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ চিরদিনই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান অবলম্বন রহিয়াছে। এ বিষয়ে যদি বাহ্যতঃ কোন ত্রুটী লক্ষিত হয়, তবে তাহার কারণ দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের মধ্যেই পাওয়া যাইবে—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা সর্ব্বদাই প্রয়োজন। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে, কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া রাজা যে নিজেই বলিয়াছেন—(Lights furnished up by both—tradition & reason) শাস্ত্রীয়প্রমাণ ও ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধির আলোক মিলাইয়া চলিতে হইবে—সমালোচক মহাশয় নিজেই তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু দেখাইয়াও তাহার অর্থ (significance) সম্যক্ ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়াই যত গোলে পতিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ চির দিন সেই পথেই চলিয়াছেন, একটুও পদস্খলিত হন নাই। ব্রাহ্মসমাজ যে শাস্ত্রকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাহা প্রদর্শন করিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা। কিন্তু শাস্ত্রকে ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে মিলাইতে গেলে শাস্ত্রের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা সকলের মনঃপূত হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া অন্ধ-শাস্ত্রবাদীরা তাহার উপর বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু ইহা রামমোহনকে অনুসরণ করিবারই ফল, তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার ফল নহে। উভয় আলোককে মিলাইতে হইবে, ইহাই রামমোহনের পন্থা। যাঁহারা কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিতে যাইবেন, তাঁহারাই রামমোহনের পথ হইতে ভ্রষ্ট।

জীবনের সকল বিভাগে মানবাত্মাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেওয়া যে রামমোহনের জীবনের সর্ব্বপ্রধান প্রয়াস ("Liberty was the passion of his life") তাঁহাকে যাঁহারা শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ মনে করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজেরই হউন আর বাহিরেরই হউন, রামমোহনকে আদৌ বুঝেন না, তাহা নিশ্চিত। দুইকে মিলাইতে হইলে, শাস্ত্র-বিবেকের বশীভূত হইবেই, গত্যন্তর নাই। ব্রাহ্মসমাজ পরবর্ত্তী কালে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন মাত্র। তাহা সময়ের পরিবর্ত্তনের ফল। বিবেক এবং শাস্ত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এই সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান না থাকার দরুণই অনেকে ভ্রান্তিতে পতিত হন। ইহাদের মধ্যে কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই। ইহারা একই বস্তুর ভিতরের ও বাহিরের দিক্। আজ যাহাকে শাস্ত্র বলি, তাহা প্রাচীনকালের বিবেক, আজ যাহাকে বিবেক বলি, পরবর্ত্তীকালে তাহাই উত্তর বংশীয়গণের নিকট শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং শাস্ত্রকে বিবেকের বশবর্ত্তী না হইলে, সমাজের উন্নতি থামিয়া যাইবে। কোনও নূতন তত্ত্ব ব্যক্তিগত বিবেকের মধ্য দিয়াই আবির্ভূত হয়। তাহা যখন লিপিবদ্ধ হয় বা গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসে, তাহাই শাস্ত্র হয়। যাঁহারা মনে করেন, শাস্ত্র আকাশ হইতে গঠিত হইয়া ঝুঁপ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাদিগের কথা বিচারের মধ্যে না আনিলেও পারি। এরূপ স্থলে বিবেকের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মীমাংসা এবং এ মীমাংসা রামমোহনেরই শাস্ত্র ও বিবেক, Tradition ও Reasonকে মিলাইবার আদেশের অবশ্যম্ভাবী ফল। যাঁহারা রামমোহনকে কেবলমাত্র শাস্ত্রবাদী মনে করেন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যদিকে আবার যাঁহারা শাস্ত্র বস্তুটা কি, কেন তাহার আদেশ গ্রাহ্য, এ বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত মত পোষণ করেন না, কোনও অতি-প্রাকৃতিক ধারণার বশীভূত—তাঁহারা যে উভয়ের মধ্যে একটা ঐকান্তিক পার্থক্যের কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যখন এইভ্রান্তি দেখি, তখন বুঝি যে, উহা নিতান্তই অজ্ঞতা-প্রসূত। কেন না, ব্রাহ্মসমাজ ভ্রান্তির স্থানই রাখেন নাই। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাহারও এরূপ ভুল হইবে না। বিবেক ঈশ্বরের বাণী এবং ইতিহাস ভগবানের লীলা, সুতরাং শাস্ত্র ও বিবেকের বিবাদ কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ তাই বলেন, তোমরা যাহাকে শাস্ত্র বল, তাহার মধ্যে শাস্ত্র অশাস্ত্র, দুই আছে। বিবেকের সঙ্গে যাহা মিলে, তাহা শাস্ত্র, যাহা মিলে না, তাহা শাস্ত্র নয়। ঈশ্বরের বাণী ভিতরে—তাহাই বিবেক, ঈশ্বরের বাণী বাহিরে—তাহাই শাস্ত্র, এবং উভয়কে মিলাইয়া অগ্রসর হও—ইহাই রামমোহন রায়ের আদেশ। ব্রাহ্মসমাজে বিবেক ঈশ্বরের বাণী—সুতরাং এ আলোক যে নিতান্ত ব্যক্তিগত জিনিস নহে, ইহা যিনি না বুঝেন, তিনি যে সমালোচক মহাশয়ের মত ভ্রান্তিতে পতিত হইবেন, তাহা অনিবার্য্য। যাঁহারা অজ্ঞানতার কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়াও জ্ঞানের বড়াই করে, তাহাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক পণ্ডশ্রম জানিয়াও দুইএক কথা না বলিয়া থাকা গেল না; কেন না, মূর্খতা প্রশ্রয় পায়। ইতিহাস ভগবানের লীলা—সুতরাং শাস্ত্র যে অপরিহার্য্য, তাহা

চিরদিনই ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে যাহাকে শাস্ত্র বলে, তাহার মধ্যে শাস্ত্র ও অশাস্ত্র, দুইই আছে। কে শাস্ত্র হইতে অশাস্ত্র বাছিয়া দিবে? রামমোহন বলিতেছেন, বিবেকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ। এই খানেই শাস্ত্রবাদীর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ। কিন্তু এ বিবাদ লাগিয়াছে রামমোহন রায়ের পথে চলিয়া, তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সমালোচক মহাশয়ের পথে চলিলে এ বিবাদ থাকিত না। রামমোহন এই পথেই চলিয়াছেন। তিনি বিবেকের দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র নামক গ্রন্থাবলীতে তো কত কি রহিয়াছে? যদি শাস্ত্রপ্রমাণই একমাত্র অবলম্বন হয়, তবে বিরুদ্ধবাদীও যখন শাস্ত্রের দোহাই দেয়, তখন উপায় কি? শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত সংস্কার প্রণালীর এই বিশেষ দুর্ব্বলতা তাঁহার অনবগত ছিল না, ইহা ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী কালের আবিষ্কার নহে। যাত্রার সময় হইতেই ইহা অবস্থানুযায়ী পরিপুষ্ট হইয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত বিচারের আর একটা দুর্ব্বলতা আছে। এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, যে কিছু নূতন তত্ত্ব বিবেক-বাণী রূপে মানব অন্তরে আবির্ভূত হইবে, তাহার সবগুলির জন্যই আমরা শাস্ত্রের মধ্যে সায় পাইব, অথবা জোর জবরদস্তি করিয়া সেই ভাবের ব্যাখ্যার জন্য শাস্ত্রের মধ্যে ভাষা সর্ব্বদাই মিলিবে। এই যে আজ কাল কত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, যাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে সে সবগুলিই হুবহু দেখিতে পান, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তিকে কি আমরা নিতান্ত হাস্যকর বস্তু বলিয়া মনে করি না? জগতের ক্রম-বিকাশে সমাজে যদি এমন কোনও সত্য আসে, যাহা আমরা শাস্ত্রের আবরণে ঢাকিতে পারিব না, তাহা হইলে সে সত্যকে কি আমরা পরিত্যাগ করিব? কখনই না। সে সত্যকে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের শাস্ত্রের পত্তন করিতে হইবে। এইরূপেই শাস্ত্র গড়িবে। নতুবা মানব সমাজের উন্নতি স্থগিত হইয়া যাইবে। এখন একটা কথা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা সংস্কার প্রণালীর যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আছে, আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেই বিপদেরই সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে কে? কাহার ব্যাখ্যা গ্রাহ্য? এই ব্যাখ্যাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইহার পশ্চাতে শক্তি কোথায়? শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার ব্যক্তি বিশেষ হইতে পারেন, যেমন রোমান ক্যাথলিক পোপ, যাঁহার ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে অনন্তকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবার ভয়ে বিশ্বাস ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, অথবা এক সম্প্রদায়, যেমন প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র যাঁহার মুঠার মধ্যে ছিল, ব্যাখ্যা করিবার অধিকারও একমাত্র তাঁহারই ছিল এবং ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে ক্ষত্রিয়ের উদ্যত তরবারী তাঁহার সহায় ছিল। এখন শাস্ত্রের গুমর ফাঁক হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই। আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম, প্রতিপক্ষ তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা দিতেছেন, কে কার কথা শুনিবে? ব্রাহ্মণের মুখেও চুরুট ভিন্ন আগুন নাই যে পোড়াইয়া মারিবে, ক্ষত্রিয়ের হস্তেও হংসপুচ্ছ ছাড়া অস্ত্র নাই যে গর্দ্দান নিবে। এরূপ স্থলে এই প্রণালীর উপর নির্ভর করা আর নাকে সরিষার তেল অর্পণ করা, একই কথা। প্রণালী উপায়, উদ্দেশ্য নহে। একটা উপায় এক অবস্থায় কার্য্য-

করী ছিল, অঙ্গহীন হইয়া সে এখন অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। পঙ্গুব সাহায্যে পথে অগ্রসর হইবার আশা বিড়ম্বনা। উপায়ের খাতিরে উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হওয়া মূর্খতা মাত্র। রামমোহনেব এ মূর্খতা ছিল না। তিনি যে কার্য্যক্ষেত্রে কোনও একটা প্রণালীব হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন নাই, তাহা আমবা পবে দেখিতে পাইব। যাহা হউক, যুক্তিব নিকট যদি এমন তত্ত্ব আবির্ভূত হয, যাহাব প্রমাণ শাস্ত্রে নাই, বরং তাহা শাস্ত্র-বিবোধী, তাহা হইলেও তাহাকে গ্রহণ কবিতে হইবে। বাজা সে পথও খোলসা কবিযাছেন। তিনি, "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যঃ বিনির্ণযঃ। যুক্তিহীন বিচাবেন ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" এই বৃহস্পতি-বচন উদ্ধাব কবিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিবর্ত্তনেব পথ পবিষ্কাব কবিযা রাখিয়া গিয়াছেন। দেশেব পবিবর্ত্তিত অবস্থায় সমাজ-সংস্কাবক্ষেত্রে বিবেক বুদ্ধি যে প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে, তাহা বামমোহন-সূচিত নিয়মেবই অভিব্যক্তি মাত্র। বাজা কি স্পষ্টাক্ষবে বলিযা দেন নাই যে, অবিচাবে অতীতেব অনুসবণ পশুব ধর্ম্ম, মানবেব নহে। রাজা বামমোহন বাযেব প্রণালী দুমুখো অস্ত্র। কোন্ মুখে কখন শান (emphasis) দিতে হইবে, তাহা অবস্থাব দ্বাবাই নির্ণীত হইবে। যে সময়ে প্রতিপক্ষও কেবল শাস্ত্রেব উপব নির্ভব কবে, তখন কেবল শাস্ত্র মুখেই শান দিলে চলে। কিন্তু যখন জাতিভেদেব পক্ষপাতিগণ সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থ-নীতি শাস্ত্রের প্রখর প্রখব (!) যুক্তি লইয়া আসবে অবতীর্ণ হন, তখন যদি সংস্কাবগণ কেবল মাত্র 'বজ্রসূচি'র ধ্বজা উড়াইয়া বসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে বাতুল ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তাঁহারা যদি তাঁহাদেব অস্ত্রের অন্যমুখে শান দিয়া থাকেন, তবে রামমোহনেব পথেই বহিয়াছেন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এরূপ না কবিলেই তাঁহাবা বাজার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেন। যখন শাস্ত্রের মধ্যে তাবতম্য-জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে এবং মন্বাদি শাস্ত্র "বজ্রসূচিব" বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে, তখন কি ঝড় মুখে তৃণেব ন্যায় বজ্রসূচি উড়িয়া যাইবে না? এরূপ স্থলে বজ্রসূচির প্রকাশ শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিরই প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রমাণ-প্রধান আন্দোলনের নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ কবিয়াও সংস্কারকগণ শাস্ত্রের উপব নির্ভর কবিয়া বসিয়া থাকিতে পাবেন না। বিপক্ষেই শাস্ত্রেব জোর সম্মতি আইনেব বেশী ছিল। সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, আজ যে দেশময় সমাজসংস্কারের জন্য এক প্রবল আন্দোলন নবীভূত হইয়া উঠিযাছে, তাহাতে শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য স্বীকাব কবা হইয়াছে। যাহাতে সমাজেব মঙ্গল হয়, তাহা অবশ্যই কবণীয়, বামমোহনের এই যুক্তি মার্গ ব্রাহ্মসমাজের অনুসবণ কবিয়া দেশ আজ ধাবতে যাইতেছেন। এ পথে শাস্ত্রেব বাধা মানিব না, ইহাই কি সংস্কাব-সমিতিগুলিব বীজ মন্ত্র নহে? সে দিন চট্টগ্রামে সামাজিক-সমিতির সভাপতিরূপে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্টাক্ষবে বলিয়া দিয়াছেন যে, শাস্ত্র যদি সংস্কারে বাধা দেয়, তবে সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অন্তর্নিহিত বিবেক-বাণী, তাহা অবলম্বন করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। অনুন্নত জাতি সকলের উন্নতি-বিধায়িনী-সভার বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ অতি তীব্রভাবে শাস্ত্রবাদীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রামমোহন নির্দ্দিষ্ট পথে ব্রাহ্ম-

সমাজের সংস্কার প্রণালীর যাথার্থ্যের ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর সমর্থন আর কি হইতে পারে? সমালোচক মহাশয় এক দিকে যেমন রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ, উভয়কেই ভুল বুঝিয়াছেন, অন্য দিকে আবার দেশের গতি যে প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে, তাহাও সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার বুদ্ধির দৌড় তো এই পর্য্যন্ত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামমোহনের প্রণালী দু'মুখো। ইহার সঙ্গে যদি কেহ এক মুখ লাগাইতে যায়, তবে যে তিনি আপত্তি করিবেন না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজা ছিলেন একজন উচ্চতর বিজ্ঞান-সম্মত হিতবাদী (utilitarian), যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাই সকলের কর্ত্তব্য, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং কেহ যদি এমন কোন উপায় আবিষ্কার করে, যাহা দ্বারা সমাজের দোষ হইতে দূরীভূত হইয়া সমাজ-দেহ সুস্থ হয়, তবে উহা প্রমাণের উপর নির্ভরতার প্রণালী নহে বলিয়া, তিনি পরিহার করিতেন না। বরং সেই ভাবে কার্য্য করিয়া ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত (শাস্ত্র) গড়িয়া রাখিতে হইবে। রোগ হইয়াছে, রোগ সারাইতে হইবে। ঔষধ ত উপায় মাত্র। যে ব্যবস্থায় রোগ সারে, তাহাই অবলম্বনীয়। যদিও রাজার মনোগত ভাব এই ছিল যে আমরা নিজেরাই সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সমাজের দোষ গুলি পরিহার করিব, তথাপিও সরকার বাহাদুর যখন সতীদাহ সম্বন্ধে লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করিলেন, তখন তিনি তৎপ্রতি প্রতিকূল ভাব দেখাইলেন না; সমাজের এতবড় একটা অমঙ্গল দূরীভূত হইল দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তাই সরকারের প্রতিবাদ না করিয়া ধন্যবাদ দিবার জন্যই টাউন-হলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই শুভকরী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যখন প্রতিপক্ষ একটা শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আপিল বিলাতে পাঠাইল, তখন রাজা এই ব্যবস্থারই পক্ষসমর্থনের জন্য বিলাত যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও প্রতিবাদ করিবার মত ভাব মনে আসা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সাধারণ মানুষ, যাহারা ব্যক্তিগত পরিহার করিতে পারে না। যে দিন রাজা সতীদাহ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ সভা করিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিন বাদসাহ কর্ত্তৃক রামমোহনকে প্রদত্ত রাজা' উপাধি গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। যে দুর্নীতি দূর করিবার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা যখন দূর হইতেছে, তখন প্রণালীর খাতিরে তিনি তাহার প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই। কর্ম্ম সাধনের উপযোগী যে কোন করণ দরকার হইলে তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইহাই তাঁহার শিক্ষা।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল। কিন্তু আর একটী কথার অবতারণা না করিয়া পারিতেছি না। সমালোচক মহাশয় বলেন যে, হিন্দু সমাজকে কোন সার্ব্বভৌমিক সমাজের আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তোলা রাজার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সমাজের যাহা দূষণীয় প্রথা, তাহা দূর করিয়া ইহাকে বিংশ শতাব্দীর উপযোগী করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। আচ্ছা, ভাল কথা। রাজা ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে, হিন্দু সমাজ কি হইলে বিংশ শতাব্দীর উপযোগী হয়, তাহা রাজা বুঝিলেন কিরূপে? সেটা কি তাঁহার কল্পনায় ছিল না? কল্পনায় (Imagination) যেটা থাকে, সেটা কি আদর্শ নয়? সমাজের আদর্শ কেবল সমা-

জই হইতে পারে। সুতবাং রাজার মনে একটা আদর্শ সমাজ ছিল। তবে সেটা সার্ব্ব-ভৌমিক কি না? রাজা কেবল হিন্দুকে বিংশ শতাব্দীব উপযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে, খ্রীষ্টান ও মুসলমানকেও সেই দিকে প্রদর্শন করেন নাই কি? বিংশ শতাব্দীই কি তবে জগতেব শেষ পবিণতি? তাই যদি হয়, তবে বিংশ শতাব্দীব দিকে গতিপ্রাপ্ত না হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাধিপ্রাপ্ত হইলে ক্ষতি ছিল কি? বাজা রামমোহন রায় এমন কবিয়া সকলকে অন্ধকাবেব দিকে ঠেলিয়া দেন নাই। তাঁহাব মানস নেত্রেব কাছে জগতেব একটা নিয়তি উদ্ভাসিত ছিল। এই নিয়তির দিকেই সকলকে তিনি টানিযাছেন। এই নিয়তিই সার্ব্বভৌমিক সমাজেব আদর্শ—হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টীয় সমাজ যাহাব আংশিক প্রকাশ মাত্র। সকলেব পূর্ণতা ঐ আদর্শ সমাজে। তিনি সকলকে এই আদর্শ অনুসারেই গড়িয়া তুলিতে চাহিযাছিলেন, তিনি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন পথে একই নিয়তিব দিকে লইযা-ছেন। কেন না, কাশী যাইতে হইলে বাঙ্গা-লীকে যে পথে যাইতে হয়, পাঞ্জাবীকে তাহাব বিপরীতমার্গ অবলম্বন কবিতে হয়। এই আদর্শ তিনি জগতেব বিভিন্ন সমাজগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াই লাভ কবিয়াছিলেন। এই আদর্শেব মধ্যে আমবা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলকেই দেখিতে পাই। এই আদ-র্শের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সমাজে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপুষ্ট অংশ এই আলোকে পুষ্টিলাভ করিবে। এখন যদি বলা যায় যে, রামমোহন এই সার্ব্বভৌমিক আদর্শের দিকে সকলকে টানেন নাই, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, রাজা বাস্তবিকই হিন্দুকে বলিয়াছেন, "তুমি খ্রীষ্টান হও"। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজা তাঁহার "ব্রহ্মোপাসনা" নামক ক্ষুদ্র পত্রীতে বলিতে-ছেন—"মানুষেব যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় কবিযা থাকেন, এক এই যে, সর্কলের নিয়ন্তা পবমেশ্ববেতে নিষ্ঠা বাখা, দ্বিতীয় এই যে, পবস্পব সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহাবেতে কাল হবণ কবা।"

"পবস্পব সাধু ব্যবহাবে কালহবণ করার নিযম এই যে, অপবে আমাদেব সহিত যেরূপ ব্যবহাব কবিলে আমাদেব তুষ্টিব কাবণ হয়, সেইরূপ ব্যবহাব আমবা অপবের সহিত কবিব, আব অন্যে যেরূপ ব্যবহাব করিলে আমাদেব অতুষ্টি হয়, সেরূপ ব্যবহাব আমবা অন্যেব সহিত কদাপি কবিব না।"

হিন্দুব ব্রহ্মোপাসনাব ধ্যান, ধাবণা, সমাধি—গভীব যোগ এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত অহেতুকী এবং প্রমত্তা ভক্তি ছিল। কিন্তু মায়াবাদেব প্রভাব ও কর্ম্মসন্ন্যাসের দিকে অতিবিক্ত ঝোঁক বশতঃ সামাজিক আধ্যাত্মি-কতার (Social piety) দিকে ত্রুটী ছিল। ব্রাহ্মসমাজ বাজর্ষিব পদাঙ্কানুসবণ করিযা এ বিষয়ে হিন্দুব আধ্যাত্মিকতাকে পুষ্টির প্রদান কবিযাছেন। এই ভাবটী খ্রীষ্টীয় সমাজেই বিশেষভাবে বিকশিত। এখন যদি বলা হয়, বামমোহনেব মনে সার্ব্বভৌমিক আদর্শ ছিল না, তাহা হইলে তিনি যখন হিন্দুকে এই ভাবের দিকে অগ্রসব হইবার জন্য আদেশ কবিয়াছেন, তখন, বলিতে হয়, তিনি হিন্দুকে বলিতেছেন—তুমি খ্রীষ্টান হও। কিন্তু বাজাব দিক হইতে সে কথা বলিবাব অবসর নাই—যদিও সমালোচক মহাশযেব দিক হইতে উহা না বলিয়া আর অন্য উপায় নাই। সমালোচক স্বকৃত ঘূর্ণীপাকে হাবুডুবু। নিজে যাহা অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন, তাহাবই

পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ বিচার করিবার আস্পর্দ্ধা,—রামমোহন রায়ের সংস্কার ও সংরক্ষণ-প্রণালীর সমালোচনা করিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজের। ধৃষ্টতারও বাহাদুরী আছে, দেখিতেছি। মানুষ যদি স্বীয় শক্তির পরিমাণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে সংসারে এতাদৃশ বিভ্রাট অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়, সন্দেহ নাই। রাজা যে সার্ব্বভৌমিক আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, ঐ খ্রীষ্টীয় ভাবটী তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং তিনি যখন ঐ ভাবটী গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, তখন তিনি হিন্দুকে এই সার্ব্বভৌমিক আদর্শানুযায়ী গড়িয়া উঠিতে বলিতেছেন। সমালোচক মহাশয় যখন বলেন, রাজার সংস্কার-প্রণালী হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি হিন্দু সমাজকে এক সার্ব্বভৌমিক সমাজের আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিতে চান নাই, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি যেমন রাজার প্রণালীও বুঝেন নাই, তেমনই, তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও উচ্চতাও ধারণা করিতে সক্ষম হন নাই। রাজা বাইবেল সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া হিন্দুকে দিয়াছিলেন, আবার বেদান্ত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া খ্রীষ্টানকে দিয়াছিলেন। কেননা, বাইবেলে যাহা সত্য, তাহা তিনি কেবল খ্রীষ্টানের সম্পত্তি, অথবা বেদান্তকে তিনি কেবল হিন্দুর ধন মনে করেন নাই। ইহারা বিশ্বমানবের সম্পত্তি; সার্ব্বভৌমিক মহাসত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অবস্থার অনুকূলতায় দেশ বিশেষে, জাতি বিশেষের মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে মাত্র। সমালোচকের ব্যাখ্যায় রাজা এই কার্য্যের দ্বারা হিন্দুকে বলিতেছেন, তোমরা খ্রীষ্টান হও, খ্রীষ্টানকে বলিতেছেন, হিন্দু হও। রাজা কিন্তু হিন্দুকে খ্রীষ্টীয় ভাবের দিকে ডাকিয়া এই আদর্শের তলেই আনিতেছেন, খ্রীষ্টানকে হিন্দুভাব প্রদান করিয়া এই আদর্শ অনুসারেই গড়িয়া তুলিতেছেন। সমালোচক রাজার কার্য্যকে হিন্দুসমাজের দূষণীয় কুপ্রথাগুলির দূরীকরণেই কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ নিবদ্ধ করিয়া এক বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। রাজার কার্য্য বিনাশ বা অভাবপক্ষীয় নহে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য গঠন, ভাঙ্গন নহে। ভাঙ্গন অবান্তর মাত্র। রাজা জগৎকে এই মহা আদর্শের দিকে টানিতেছেন। এই আদর্শের আলোকে প্রকৃত সমাজে অনেক ভুল ভ্রান্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই আদর্শ ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে হইলে এই ভুল ভ্রান্তি অবশ্য পরিহার করিতে হইবে। ভাঙ্গন সেই জন্য, উহা মূলকার্য্য নহে। মূলকার্য্য ঐ আদর্শ অনুসারে জগৎকে গড়িয়া তোলা। এই সার্ব্বভৌমিক সমাজের আদর্শানুযায়ী গড়িয়া উঠিলে বিভিন্নতা চলিয়া গিয়া সকলে এক হইয়া যাইবেন,—হিন্দুকে খ্রীষ্টান কিম্বা খ্রীষ্টানকে হিন্দু করিয়া নহে, কিন্তু সকল সমাজকে এই আদর্শে সমাজে পরিণত করিয়া। ইহাই জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মিশন। যদি কাহারও সাধ্য থাকে, তিনি বলুন যে, এ তত্ত্ব জগতে আর কখনও প্রচারিত হইয়াছিল।

আর একটী কথা বলিব। আজ আর কাহারও পক্ষে স্বীয় সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে বসিয়া থাকিবার সুযোগ নাই। স্বীয় সাম্প্রদায়িক নামে পরিচয়টার স্থানও যেন সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। দু-দিনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়াই বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমরা ভারতবাসী, এই কথা আগে, হিন্দু মুসলমান জৈন পার্শী, এসব খেতাব পিছনে রাখিয়া

দাও, জগতের কার্য্যক্ষেত্র আরও কত বিস্তৃত। সকল জাতিকেই আজ বিশ্বমানবের দরবারে হাজির হইতে হইয়াছে। হিন্দু আর বলিতে পারেন না যে, তিনি আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই সিদ্ধি লাভ করিবেন। তবে এই সার্ব্বভৌমিকের সংস্পর্শে আসিলেই যে তাহার বিশেষত্ব নষ্ট হইবে, তাহাও নহে। সার্ব্বভৌমিকতা জাতীয়তাকে নষ্ট করে না, তাহাকে পুষ্ট করে। কিন্তু পুষ্ট হইতে হইলে এই সার্ব্বভৌমিক-ভীতি সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। অবস্থা বিশেষে সার্ব্বভৌমিকের উপর জোর দিলে যাঁহারা মনে করেন, রামমোহনের পথ হইতে স্খলিত হওয়া হইল, তাঁহারা রামমোহনের আদর্শ হইতে এখনও বহুদূরে। তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে সমর্থ হন নাই।

অন্তিম-সময়।

(১)

জীবন-তটিনী তটে, জীর্ণ দেহ-তরী
সহি ঝড় ভয়ঙ্কর,
দিবানিশি নিরন্তর,
আসিয়া লেগেছে সত্য, উপায় কি করি?
সম্মুখে ভীষণ সিন্ধু কেমনে বা তরি?

(২)

গর্জ্জিছে জীমূত মন্দ্রে ভীম পারাবার,
উঠেছে কালের ঝড়,
বীচিমালা নিরন্তর,
নাচিছে তাণ্ডব নৃত্য উরসে তাহার,
কার সাধ্য দীর্ণ করে বপ্রের আকার।

(৩)

স্থানে স্থানে ভগ্ন তরী করে টলমল,
ঝলকে ঝলকে জল,
উঠিতেছে অবিরল,
তাহে খরস্রোত নদী নাদে কলকল,
হেরিয়া প্রকৃতি এবে হ'তেছি বিকল।

(৪)

সাজিছে জলদ জাল সুনীল অম্বরে,
দেখিতে দেখিতে বিশ্ব,
ক্রমেই বিলুপ্ত দৃশ্য;
ঢাকিছে সমগ্র নভ তিমির-অম্বরে,
নিখিল বসুধা যেন অমার আঁধারে।

(৫)

জীর্ণ শীর্ণ গ্রন্থিহীন কাষ্ঠ মাত্র সার,
এদেহ-বহিত্র খানি
চালা'তে অশক্ত আমি,
তাহে ভগ্ন কর্ণ আর ক্ষেপণি নিকর,
কেমনে চলিবে তরী? বিষণ্ণ অন্তর।

(৬)

দাঁড়ী মাঝি ছিল যত গণিয়া বিপদ,
পলায়েছে ক্রমে তারা,
না দিয়া শবদ সাড়া,
একাকী দুর্ব্বল আমি চিন্তি বিভুপদ,
যাঁর নামে হয় নিত্য বিপদ সম্পদ।

(৭)

দারা পুত্র পরিবার ছিল সঙ্গে যারা,
থাকি সদা অনুগত,
অর্থ হেতু বশীভূত,
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি কোথা গেল তারা
সঙ্গীহীন হ'য়ে ভোগী নিরজন কারা।

(৮)

চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত তিমির দুস্তর,
ব্যাদানি ভীষণ গ্রাস,
জন্মায়ে বিষম ত্রাস,
গ্রাসিছে নিখিল ধরা অতি ভয়ঙ্কর,
কেমনে তরিবে তরী হতাশ অন্তর।

(৯)

এদিকে রোগের হায় অসীম যাতনা,
করিতেছে জরজর,
এই শুষ্ক কলেবর,

ভাঙ্গিতেছে অস্থি গুলি, সহেনা সহেনা।
ফুরাইল সব আশা সকল বাসনা।

(১০)

কোথা পুত্র কোথা কন্যা আত্মীয় স্বজন?
সকলে ত্যজিয়া মোরে,
র'যেছে নিজের ঘরে,
আমি একা বন্ধুগন কোথা পরিজন?
কেহনা সুধায় মোরে ডাকিয়া এখন।

(১১)

চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ ইন্দ্রিয় নিচয়
সকলি জড়েব মত,
হইতেছে ক্রমাগত,
নাহি শুনে বাণী মোর, বধিব নিশ্চয়,
বাজায় কালেব ভেরী কাল নিবদয়।

(১২)

বিকট শমন আসি প্রকটি দশন,
চাহে কেশ ধরিবারে,
মুদগব বিশাল করে,
সঘনে বাজিছে ভেরী অতীব ভীষণ,
আতঙ্কে কাঁদিছে প্রাণ কবিয়া শ্রবণ।

(১৩)

দিবস শর্ব্বরী নিত্য যাহাদের তবে,
করেছি অর্জ্জন কত,
পালিয়াছি রীতিমত,
না ভাবি উপায় পন্থা শ্রান্ত কলেবরে,
এখন চলিনু একা পিতৃ পতি ঘরে।

(১৪)

এই যে সুদৃশ্য গৃহ প্রকাণ্ড প্রাসাদ,
কবিয়াছি নিরমাণ,
কে কবে অর্থের মান,
ফেলাযেছি অর্থ রাশি না গণি প্রমাদ,
এখন অভাব হেতু কতই বিষাদ।

(১৫)

বোগ শোক হেতু জবা এসেহে এখন,
পলিত কুন্তল বাশি,
দশন পড়িছে খসি,
অমল ধবল শ্মশ্রু, মূবতি ভীষণ,
হয ভয আপনাকে কবি নিরীক্ষণ।

(১৬)

শ্বাস কাস অতিসাব ব্যাধি অগণন
আসিযা দিতেছে দেখা,
ভাগ্যে কিবা আছে লেখা;
হ'তেছে কালের নেমী নিত্য আবর্ত্তন,
খাইতেছি দিগ্ বাজি হায অনুক্ষণ।

(১৭)

জ্ঞানেব ভাণ্ডার বলি সম্মানিত মোরে,
কতশত নবনারী
কিবা দিবা বিভাবরী,
সুব গুরু জ্ঞানে পূজা হ'তো ঘবে ঘবে,
সুধা'ত সকল বার্ত্তা অতীব সাদবে।

(১৮)

সেই আমি আজও আছি—কেহ না সুধায়,
নির্ব্বোধেব শিরোমণি,
গ্রহ মধ্যে যেন শনি,
উপাধি দিতেছে সবে দুর্ব্বল আমায়,
এইত ভবের রীতি, কি করি উপায়?

(১৯)

কেন মন ভীত হও, হ'য়ে বন্ধুহীন?
এসেছ একাই ভবে,
একাই যাইতে হবে,
দাবা পুত্র পবিবাব মাত্র দুইদিন,
কেন ভেবে ভেবে এত হতেছ মলিন?

(২০)

ডাকবে মানস ভৃঙ্গ সত্য-নিবঞ্জনে,
গুণ গুণ কবি ধ্বনি
জাগাও এ ক্ষুদ্র প্রাণী,
হউক মঙ্গল বাদ্য মধুব নিক্কণে,
চলুক দেবের পূজা এ দেহ-ভবনে।

(২১)

ওহে পিতঃ ভগবন্ পতিতপাবন,
ত্য'জ না সন্তানে কভু,
তুমি দযাময় বিভু,
তুমি আছ তেঁই আমি নহে একজন
পিতার ক্রোড়েতে শুযে মুদিব নয়ন।

(২৩)

কালেব বিকট মূর্ত্তি বহে কতক্ষণ,
পিতা যদি ল'ন কোলে
আদবে সন্তানে তু'লে,
তবে কি ধবিতে পারে নির্দ্দয় শমন?
মাভয়ি মাভবি রবে কাঁপায় ভুবন।

(২৩)

এ দেহ-পিঞ্জরে মন আছে যতক্ষণ,
গাওনা মধুর স্বরে,
ঈশনাম জোড়করে,
প্রীতির চন্দনে তাঁর মাখিয়া চরণ,
ভকতি-কুসুমে পুজ সত্য-সনাতন।

(২৪)

এখন সময় নাই যদিও নিশ্চয়,
তবু হ'য়ে একপ্রাণ,
পঞ্চমে তুলিয়া তান,
ডাক ডাক একবার প্রভু দয়াময়,
পাপ, তাপ, জরা, ব্যাধি পাইবে বিলয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু-মজুমদার।

আদিশূরের রাজধানী গৌড় ও বিক্রমপুর।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে ইতিহাসের গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া জ্ঞানের পরিচয় দেয়, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তদ্রূপ ইতি-হাসের বিশেষ আদর ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারতই ভারতের ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন যাহা history নামে পরিচিত হইবার যোগ্য, ভারতে তাহা ইতিবৃত্ত নামে অভিহিত হইতে পারে। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ ভ্রম প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা শূন্য হইতে পারে না বলিয়াই, হিন্দুগণ ইতিবৃত্তে বিশেষ আস্থা ও মূল্য স্থাপন করে নাই। উল্লিখিত দোষত্রয় নিবন্ধনই আধুনিক ইতিহাস নানা ভ্রম প্রমাদে পূর্ণ ও ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে নানা মত-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারার্থে স্থানীয় কিম্বদন্তীর অনুধাবনও অত্যাবশ্যক। ১৩১৮, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু বি-এ মহাশয় গৌড়াধিপতি আদিশূরের রাজধানী নির্ণয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া, উপসংহারে কেবল মালদহের অন্তর্গত গৌড়নগরেই মহা-রাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই মীমাংসা খণ্ডনার্থে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ আবশ্যক মনে করি।

মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থে বঙ্গে দুইবার ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণার্থে মহারাজ আদিশূর ও কান্য-কুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের একখানি পত্র ও পত্রোত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পত্র :—

নৃপতি সুকৃতি সারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ
প্রবল-বল-বিচারো-বীরসিংহোঽতিধীরঃ
ময়ি বর সখিতাস্তে ভূমি দেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি মমগৌড়ে প্রাপয ত্বং নিতান্তম্॥

উত্তর :—

মহারাজ রাজা আদিশূর মহাত্মাতয়া
বীরসিংহস্য মে হস্তাদি সম্যক্ঃ
আজ্ঞানু-সারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্
পঞ্চ গোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্॥*

মহারাজ আদিশূরের পত্রের চতুর্থপাদে

* আমার বোম্বে অবস্থান কালে এই পত্র ও পত্রোত্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা দীর্ঘকাল হইল বলিয়া কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। কাজেই গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইতে পারিল না। প্রবন্ধ-লেখক।

"পুনরপি" শব্দ থাকাতে গৌড়ে যে দুই বার ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল, তাহাই স্পষ্ট প্রমাণীত হয়। তৎসম্বন্ধে বিক্রমপুর অঞ্চলেও নিম্নলিখিতরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।" উজ্জয়িনী অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য তালবেতাল সাধনায় উজ্জয়িনী নগরে সিদ্ধলাভ করিতে না পারিয়া, গুরুর আদেশে কামরূপ যাইয়া কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে হত্যা দিয়াছিলেন। তাহাতে দেবী তাঁহাকে ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষা নদীর মোহনায় সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সৈকত-ভূমিতে আসিয়া শব-সাধনার নিমিত্ত স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবীর আদেশে শ্রীহট্ট-পথে উক্ত সৈকত-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ বজ্রী নাম্নী এক যোগিনীর নিকট দীক্ষা গ্রহণে শব-সাধনা করেন ও পরে অদূরবর্ত্তী এক স্থানের পাঁচজন তান্ত্রিক যোগীর সাহায্যে তালবেতাল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। উক্ত যোগিনীর নামানুসারে এখনও বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম রহিয়াছে। অপর যোগী-পঞ্চ যে স্থানে সাধনা করিতেন, তথায় বর্ত্তমান "পঞ্চসার" গ্রাম অবস্থিত। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নামানুসারেই উল্লিখিত সৈকতভূমি "বিক্রমপুর" নামে অভিহিত হইয়াছে। অনেকে বিক্রমপুরের রামপাল-স্থিত গজারী বৃক্ষকে ব্রাহ্মণগণের অর্ঘ্য বাবিজীবিত হস্তী-বন্ধনকাষ্ঠ (মল্লকাষ্ঠ) না বলিয়া, বিক্রমাদিত্যের সাধন-শব-কীলক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর আসিবার পথে শ্রীহট্ট কতক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অবস্থান স্থানও শ্রীহট্ট জিলায় বিক্রমপুর নামে অভিহিত। "তিনি তালবেতাল সিদ্ধ হইয়া, সঙ্গে আনীত তাঁহার বত্রিশসিংহাসন শীতলক্ষা নদীতে বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জল এরূপ নির্ম্মল, অনেকে এরূপ মত প্রকাশ করে। বিক্রমাদিত্যের শব-সাধনার পর বিক্রমপুর দীর্ঘ কাল অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সাধনার্থে কান্যকুব্জ হইতে প্রথমবার যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌড় নগরেই উক্ত যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান নহে। প্রথম বারে আনীত ব্রাহ্মণগণ কিছুকাল এ দেশে অবস্থানের পরই যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কাণ্ড বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাহার পরেও পুনরায় অপর কোন যজ্ঞ সমাপন আবশ্যক হওয়াতে, দ্বিতীয় বারও কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের যে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রথমতঃ গৌড় নগরেই উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলেন, "গৌড়ের" যাজ্ঞিক ক্রিয়ার স্থান-মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সময় তাঁহারা তপোবলে, অতি প্রাচীন কালের মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বোক্ত সাধন-ক্ষেত্র বিক্রমপুর যজ্ঞের প্রশস্ত স্থল বুঝিতে পারিয়া, মহারাজ আদিশূরকে তথায় যাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের উপদেশেই বিক্রমপুর আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুর গৌড় নগর অপেক্ষাও অধিক মাহাত্ম্য পূর্ণ ভূমি জানিয়া সে স্থানেও এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌড় ও বিক্রমপুর, উভয় স্থানেই যে মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ করারও কোন কারণ নাই।

মহারাজ বীরসিংহের পত্রোত্তরের চতুর্থ

পাদে "পঞ্চ গোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান" লিখিত আছে। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, দ্বিতীয় বারে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের পত্নীগণ এবং ভৃত্যগণও বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ প্রথম বারের আনীত ব্রাহ্মণ গণের সন্তান। বঙ্গাধিপতি তাঁহাদিগকে গৌড়ের সমীপবর্ত্তী বরেন্দ্র ভূমিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণই দ্বিতীয় বারে আনীত ব্রাহ্মণ পঞ্চের সন্তান। মেল বন্ধনের সময় যে সমস্ত গ্রাম অনুসারে তাঁহাদের "গাই" ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ গ্রামই বিক্রমপুরে অব স্থিত। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বাবু কুলপঞ্জী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনটী দ্বারাই ব্রাহ্মণ গণ গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন ব্যতীত, বিক্রমপুরে যে মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিলনা, তাহা প্রমাণিত হয় না। উভয় পঞ্চ ব্রাহ্মণই প্রথমতঃ গৌড়ে আনীত হইয়া ছিলেন। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় প্রথম বারে আনীত ব্রাহ্মণগণের আগমন ও অবস্থান লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বিবরণ, কায়স্থ-সংহিতা, ও দীপঙ্করের বিবরণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রম-প্রমাদ ও বিপ্র-লিপসা দোষ শূন্য, তাহা কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রে সংহিতা সমূহ দ্বাপরের যুগ-শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে সংহিতা মুসলমান ঐতিহাসি কের বিবরণ মূলে লিখিত, তাহা শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা। বল্লাল সেন বৈদ্য বলিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় একখানি তাম্র-শাসনের অনুবলে তাঁহাকে চন্দ্র বংশীয় নৃপতি বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। এখন আবার শুনিতে পাই, প্রাচীন কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র আদিশূরকেও "চিত্র গুপ্তের বংশের অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থ বংশজ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কালে ইঁহারা উভয়ে আবার অপর কোন জাতিতে স্থান প্রাপ্ত হইবেন কিনা, সেই তত্ত্বোদ্ধার ভবিষ্য-তের গর্ভে নিহিত। গত আদম-সুমারীর পূর্ব্ব আদম সুমারীর আন্দোলন কালে, এক-জন কায়স্থ লেখক করাতিয়া বসুর ঐতিহা-সিক সংগ্রহে আদিশূরকে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। কাশীর কৃষ্ণানন্দ স্বামীর মোকদ্দমার সময়, তৎসংসৃষ্টা বালি-কার মাতাও আপনাকে আদিশূর-বংশীয়া বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালা-গ্রন্থে নোয়াখালি জেলার কায়স্থ জাতীয় শূরদিগকে আদিশূরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ নিত্য নবায়মান ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা যুক্তি-যুক্ত কিম্বদন্তীই আমরা অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য মনে করি। সুতরাং মোহিনী মোহন বাবুর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমূহ নির্দ্দোষ প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। তিনি প্রবন্ধের অন্য স্থানে "বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়-স্কন্ধাবারাৎ" পদ দ্বারা বিক্রমপুরে কেবল সেন রাজগণের শিবির ছিল বলিয়া প্রমাণিত করারই চেষ্টা পাইয়াছেন। অপর স্থলে তিনি মুসলমানদিগের ভয়ে লক্ষ্মণ সেনের পূর্ব্ববঙ্গে পলায়নের কথারও উল্লেখ করিয়া-

ছেন। এতদুভয় উক্তিই নিতান্ত অযৌক্তিক। তিনি যদি ভারতের বর্ত্তমান সময়েরও কোন দেশীয় নৃপতির রাজধানী পরিদর্শন*করিতেন, তাহা হইলে স্কন্ধবার শব্দ যে রাজধানী অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সমাবাসিত শব্দ যোগে এরূপ অর্থের যে কোন ব্যত্যয়ই ঘটেনা, তাহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিতেন। ভারতে স্বাধীন ভূপতিগণ যখন যে স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তখনই তাহা দুর্গ-বন্ধ সহর (Fortified city) রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাজপুতনার জয়পুর, আলোয়ার, কিষণগড়, ভরতপুর অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজধানী সমূহও দুর্গবন্ধ সহর। এমন কি, নব আজমীর সহরও দুর্গবন্ধ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। আকবার বাদসাহ-ভবন ও নব-দিল্লী সাজাহানাবাদের বাদসাহ-ভবন দুর্গ-বন্ধ বলিয়া তাহাই এখন আগরা কেল্লা (Fort) ও দিল্লী কেল্লা (Fort) নামে অভিহিত। ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি মিবারের প্রাচীন রাজধানী চিতোর "চিতোর গড়" নামে পরিচিত।

"গড় তো চিতোর্ গড়্ আউর সব্ গড়িয়া।
রাণীতো কমলাবতী আউর সব্ গাধিয়া॥
তাল্ তো ভূপাল তাল্ আউর সব তলিয়া॥"

এই কথাটী পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত। চিতোর রাজধানী দুর্গ-বন্ধ সহর এবং তাহা এরূপ উচ্চ পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত যে, তথায় আরোহণ করিতে আমাকে কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং স্কন্ধাবার শব্দ দ্বারা কেবল শিবির অর্থ প্রতিপাদনের কোন কারণই দৃষ্ট হয়না এবং "সমাবাসিত" শব্দ যোগেও তাহা সমর্থিত করার কোন কারণ নাই। লক্ষ্মণ সেনের পূর্ব্ব বঙ্গে পলায়ন সংবাদও সম্পূর্ণ ভ্রম-বিজৃম্ভিত। এই কথার প্রতিবাদার্থে আমাদিগকে এখন মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বে আসিয়াই উপনীত হইতে হইবে।

মহারাজ বল্লাল সেন যে সময় বঙ্গাধিপতি, সে সময় লক্ষ্মণ সেনই তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তান ও ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের যৌবনে পদার্পণের পরই তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল। বৃদ্ধ মহারাজা আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করিযাছিলেন না। সে সময় তিনি আসাম বিজয় করিয়া, তথা হইতে পরম রূপলাবণ্যবতী পদ্মিনী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহাকেই স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিয়া, স্ত্রী-সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। পুত্র লক্ষ্মণ সেন নিতান্ত চরিত্রবান কুমার ছিলেন, বার্দ্ধক্যেও পিতার এরূপ মতিচ্ছন্নতা দর্শনে তাঁহার সহিত পিতার পরোক্ষ উক্তিতে যে বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

লক্ষ্মণঃ—

শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী
স্বচ্ছতা।
কিংব্রূমঃ শুচিতাংভবন্তি শুচয়ঃ সপর্শেন
যস্যাপরো।
কি চাতঃপরমং তব স্তুতি পদং ত্বং জীবনং
জীবিনাং।
ত্বং চেৎ নীচপথেন গচ্ছসি পযঃ কস্তাং নিরো-
দ্ধুং ক্ষমঃ॥

হে জল। তুমি স্বভাবতই সুশীতল এবং তোমার স্বচ্ছতাও স্বাভাবিকী। তোমার পবিত্রতার কথা আর কি বলিব, তোমার স্পর্শে অপরেও শুচি হয়। ইহাপেক্ষা তোমার আর কি

*মৎপ্রণীত "ভারত-ভ্রমণ" দ্বিতীয় খণ্ডে চিতোরের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

প্রশংসা হইতে পারে যে, তুমি সমুদয় জীবগণের জীবনস্বরূপ। যদি তুমি নীচ পথে গমন কর, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তোমাকে বারণ করে?

বল্লাল,—তাপো নাপগত স্তৃষা নচ কৃশা

ধৌতান ধূলী তনে-

ন স্বচ্ছন্দ মকারি কন্দবলঃ কানাম কেলী কৃতা।

দূরোৎক্ষিপ্ত করেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টোনবা

পদ্মিনী।

প্রারব্ধো মধুপৈরকারণ মহোঝঙ্কার কোলাহলঃ।

নিদাঘ-সন্তপ্ত হস্তী কেবল জলে নামিয়াছে, এখনও তাহার দেহের তাপ দূরীভূত হয় নাই। সে জল পান করিয়া পিপাসাকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই। জলমগ্ন হইয়া সে এখন পর্য্যন্তও শরীরের ধূলী কর্দ্দম ধৌত করিতে সমর্থ হয় নাই। জলে নামিয়া সে যে এ পর্য্যন্ত ভৃতটা কন্দ মূলাদি ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাও নহে। জল কেলির কথা এখন কোথায়? আর তাহার নিকটে যাওয়া দূরে থাকুক, দূর হইতেও যে পদ্মিনীকে কর প্রসারণ পূর্ব্বক স্পর্শ করিবে, তাহাও করে নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই যে ভ্রমরগুলি ঝঙ্কার দিয়া অকারণ কোলাহল করিয়া উঠিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

লক্ষ্মণ—পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথো

বাপিমহতাং

অতথ্যস্তথ্যোবা হরতি মহিমানং জনরবঃ॥

তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিত হতাশেষে তমসঃ

রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ।

লোকাপবাদ ও জনরব সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, কোন কিছুর রটনা হইলেই মহৎ ব্যক্তির মহিমার লাঘব হইয়া থাকে। তুলা রাশিতে থাকিয়া,সূর্য্য যে খর কিরণ দ্বারা অশেষ তমঃ বিনাশ করেন, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু তুলারাশি উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি যখন কন্যারাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন কি সেই মহামহিম সূর্য্যের তেজ খর্ব্বীভূত হয় না?

বল্লাল,—সুধাংশোর্জ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য

কণিকা।

বিধাতুর্দোষোঽয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি॥

স কিং নাত্রেঃ পুত্রোন কিমুহর চূড়ার্চণমণিঃ

নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি?

শুভ্রাংশু চন্দ্রে এই কলঙ্ককণিকা কেন জাত হয়? ইহা বিধাতার দোষ, গুণনিধি চন্দ্রের নহে। তদ্যতীত কি চন্দ্র অত্রির পুত্র ও হরচূড়ার্চণ মণি নহে? সে কি দীপ্তি বলিয়া কি জগতের অন্ধকার নাশ করে না? না, জগতের উপরে বাস করে না?

পিতাপুত্রের এইরূপ বাদ প্রতিবাদেও কোন সুফল ফলিল না। অবশেষে পুত্র পিতার ক্রোধানলে পতিত হইয়া, বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। লক্ষ্মণ সেন নির্ব্বাসিত হইয়া, দীর্ঘকাল গঙ্গাগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় পুত্রবধূ স্বামী-বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া শ্বশুরকে মনোবেদনা জানাইবার মানসেই তাঁহার ভোজন প্রকোষ্ঠে লিখিয়া রাখিলেন।

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা

অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি।*

বারি অবিরত পতিত হইতেছে, ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, অদ্য কান্ত কি কৃতান্ত একজন আমার দুঃখ দূর করিবেন।

মহারাজ বল্লাল সেন ভোজন করিতে বসিয়াই পুত্রবধূর এই বিরহ-কবিতা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি ঘোষণা করিলেন "অদ্য রাত্রির মধ্যে যে ব্যক্তি লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে

* কল্যাণ, লক্ষ্মী বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে মুদ্রিত কাতি নির্ণয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পারিবে, সে ব্যক্তি যে প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি পূর্ণ করিব।" তচ্ছ্রবণে বিক্রমপুরের হালুয়া দাসগণ নৌকা বাহিয়া, রাত্রি মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনকে বিক্রমপুরের রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। মহারাজ বল্লালও তাহাদের প্রার্থনানুসারে তাহাদের জলচল করিয়া দিবা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা বিক্রমপুরেই সংঘটিত হইয়াছিল।

মহারাজ বল্লাল আসাম হইতে আনীতা পদ্মিনীর প্রণয়ে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার সন্তুষ্টির নিমিত্ত অবশেষে তাঁহার স্বজাতীয় লোকদিগকে তাহার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সে সময় পুত্র লক্ষ্মণ সেন জাতিনাশ ও নিরুপায় ভাবিয়া, স্বজাতীয় লোকদিগকে লইয়া রাঢ় দেশে পলায়ন করিয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে অক্ষম হইয়াছিল, তাহাদিগকে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া, জাতিরক্ষার উপদেশ করিয়া গেলেন। তদবধিই পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণ উপবীত-ত্যাগী হইল. এবং পরিশেষে বল্লালী ও লাক্ষ্মণীরূপে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। লক্ষ্মণসেনের জাতিরক্ষা ভয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে পলায়ন ভিন্ন. পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন-বৃত্তান্ত কোন ইতিহাস বা কিম্বদন্তীতে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন মানসে প্রথমবারে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যজ্ঞফলে তাঁহার ভূশূর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূশূর অনপত্য অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আদিশূরের একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে ও তাঁহার সেনবংশীয় স্বামীর ঔরসে অশোক সেন নামে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজত্ব শূরবংশ হইতে অবশেষে তাহারই হস্তগত হইয়াছিল। অশোক সেন বঙ্গের সেন বংশের প্রথম রাজা। বল্লাল সেন তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ রাজা। বঙ্গের যে রাজার সময়ে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী বঙ্গ-আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম সুষেণ বা লাক্ষ্মণ্য সেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে মুসলমানগণ বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল না। লাক্ষ্মণ্য সেন ও মুসলমানদিগের ভয়ে নীলাচলে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে পলাইয়া গিয়াছিলেন, তিনি পলায়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন না। পাঠকবর্গের বুঝিবার নিমিত্ত আদিশূর হইতে বঙ্গের বৈদ্যরাজদিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদিশূর।

ভূশূর। লক্ষ্মীদেবী

অশোক সেন।

শূরসেন।

বীরসেন।

সামন্ত সেন।

হেমন্ত সেন।

বিশ্বক সেন। (বিজয় সেন)

বল্লাল সেন। (ক্ষেত্রজ পুত্র)

লক্ষ্মণ সেন।

মাধব সেন।

কেশব সেন।

সুষেণ। (লাক্ষ্মণ্য সেন)

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ও বিক্রমপুরে বঙ্গাধিপতিগণের রাজধানী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী

আমরা একরূপই জানি। এখন প্রত্নতত্ত্ব অথবা ঐতিহাসিক গবেষণা বলে কেহ অন্যরূপ ভাবোদ্ধার করিলে, তাহাতে আমাদের বলিবার আর কিছু নাই। শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত।

সাংখ্যসূত্র।

৫৩। **সর্ব্বত্র জরা মরণাদি জনিত দুঃখ সমান।**

(সর্ব্বত্র = আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে। অথবা স্বর্গাদি সকল লোকেই।

৫৪। **কারণে লয হইলেও কৃতকৃত্য হয না। মগ্ন হইলেও আবার উত্থান হয়।**

প্রকৃতিতে বা কারণে লয় হইলেও কৃতকৃত্য হওয়া যায না। স্নান কালে জলমগ্ন লোক যেমন সংস্কার বলে পুনরুত্থিত হয, সেইরূপ কর্ম্মক্ষযে বা পুনঃ সৃষ্টি কালে যাহাদের মূল প্রকৃতিতে লয় হইযাছে, তাহাদেরও পুনরুত্থান হয। (অনিঃ)।

শাস্ত্রে আছে—

"দশমন্বন্তরানীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রংত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রানি তিষ্ঠন্তি বিগত জবাঃ।
পূর্ণং শত সহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কাল সংখ্যা ন বিদ্যতে।

প্রকৃতি উপাসনা দ্বারা মহদাতিতে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতিলয় হয়। কিন্তু তাহাতে মোক্ষ হয় না। ঈশ্বর ভাবে প্রকৃতিলীন পুরুষেরও সৃষ্টি কালে পুনঃ উত্থান হয়। বিবেকখ্যাতি বিনা পুনরুত্থানের কারণের বীজভূত দোষ দূর হয় না। (বিঃ ভিঃ)।

পাতঞ্জল সূত্রে আছে—

"ভব প্রত্যয়া বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্"। ১।১৯

৫৫। **প্রকৃতি কাহারও কার্য্য না হইলেও সেই পুরুষের সহিত তাহার যোগ হেতু পরতন্ত্রতা আছে।**

সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতিলীন পুরুষের সহিত প্রকৃতির যোগ হেতু প্রকৃতির পরিণাম হয। কেন না প্রকৃতি অকার্য্য (বা কারণান্তর ব্যতিরেকে স্বতঃ পরিণামশীল) হইলেও, পরবশ। পরিণাম জন্য পুরুষের সংযোগ অপেক্ষা করে। (অনিঃ)।

প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে—তাহাকে কেহ প্রেরণ করে না। সে কাহারও ইচ্ছার অধীন নহে। কিন্তু তাহার যোগেই তাহাতে লীন পুরুষের পুনর্ব্বার উত্থান হয়। তাহাকে পূর্ণ মুক্ত করিবার জন্য প্রকৃতির পুনঃ সর্গ লাভ বা পরিণাম হয। অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি রূপ পুরুষার্থতা জন্য প্রকৃতিতে লীন পুরুষকে প্রকৃতিই পুনরুত্থান করায। নহিলে, সে পুরুষের পূর্ণ মুক্তি সম্ভব হয না। পুরুষার্থ প্রকৃতির প্রেরক নহে। তাহা প্রবৃত্তিস্বভাবা প্রকৃতির প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির প্রতিনিমিত্ত-কারণ। এজন্য প্রকৃতির স্বতন্ত্রতার হানি হয না। পাতঞ্জল সূত্রে আছে—

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতিনাং বরণ ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।" (বিঃ ভিঃ)।

এই সূত্র হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, যে সকল পুরুষ সাধনা বিশেষ বলে প্রকৃতিতে লীন হয়, তাহাদেরও নির্ব্বাণ মুক্তি হয় না। তাহাদিগকে নির্ব্বাণ মুক্তি দিবার জন্য প্রকৃ-

তির সৃষ্টিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। এবং এই সৃষ্টি সম্বন্ধে সেই সকল সিদ্ধ প্রকৃতি লীন পুরুষই ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভাদি রূপে প্রবর্ত্তক হন।

৫৬। তিনি-ই সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা হন।

প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াই সেই প্রকৃতি-লীন পুরুষ সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বকর্ত্তা হন। এই ঈশ্বরত্ব অভিমানিক, তাত্ত্বিক নহে। (অনিঃ)।

যিনি পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কারণে লীন ছিলেন, তিনিই সর্গান্তরে সর্ব্ববিদ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর প্রভৃতি পুরুষ হন। কারণ প্রকৃতিতে লয় হইলে সে পুরুষেরই প্রকৃতি পদ প্রাপ্তি উচিত। (অনি)।

শ্রুতিতে আছে—

"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্য।"

পাতঞ্জল যোগ সূত্রে আছে যে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার—ভব প্রত্যয় সিদ্ধ ও উপায় প্রত্যয় সিদ্ধ। ভব প্রত্যয়েই প্রকৃতি লয় হয়। সে লীন অবস্থা পরবর্ত্তী সৃষ্টি পর্য্যন্ত থাকে।

এই প্রকৃতি লীন পুরুষদের সিদ্ধপুরুষ বলা যায়। তাঁহারাই পর সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভাদি হইয়া থাকেন।

ইহাই সাংখ্যের ঈশ্বরবাদ। সাংখ্যদর্শনে নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্য দর্শন অনুসারে নিত্য ঈশ্বর অসিদ্ধ। কেবল এই সিদ্ধেশ্বরই স্বীকৃত। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেই জীব। যেমন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম জীব, সেইরূপ ঈশ্বরও জীব। জীবই সাধনা বলে সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বর হন্। প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ যখন সাধনা বলে সিদ্ধ হন, তখন তাহাদের সিদ্ধেশ্বর বলে। বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতিজ লিঙ্গ দেহ—অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্ত্ব দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহে বদ্ধ। এই লিঙ্গ দেহ হইতে মুক্ত হইলেও পুরুষ মূল প্রকৃতি রূপ কারণ দেহে তাহারা বদ্ধ বা লীন থাকে। ইহাই এই সিদ্ধাবস্থা। এই সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁহারা প্রকৃতিতে লীন থাকেন। বদ্ধ পুরুষের কর্ম্ম বলে প্রকৃতি পরিণাম বা সৃষ্টিকালে তাঁহারাই ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভাদির রূপে অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা হইয়া প্রকৃতির পরিণামের কারণ হয়। কেবল অধিষ্ঠান মাত্রেই তাহাদের এই কর্ত্তৃত্ব।

৫৭। এইরূপ ঈশ্বর-সিদ্ধি সিদ্ধ হয়

পূর্ব্বে এক সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর অর্থাৎ নিত্য ঈশ্বর—প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধ ঈশ্বর প্রমাণ গম্য। (অনিঃ)।

শ্রুতিতে এই জন্য ঈশ্বরই সিদ্ধ হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)।

শ্রুতিতে আছে—

"সঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময় তপঃ—"

নিত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবাদ বা মতভেদ আছে। অন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবাদ নাই। পাতঞ্জল ন্যায়দর্শনে নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত। সাংখ্যে নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই।

এই সূত্রে ও পূর্ব্ব সূত্রে প্রকৃতির পরবশতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পুরুষ সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বশক্তি বিশিষ্ট। অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধি মাত্রই তিনি প্রকৃতির প্রেরক হন। যে সকল পুরুষের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় নাই, তাহাদের সন্নিধি হইতে তাহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধি অন্য প্রকৃতি তাহাদের ইচ্ছার অধীন না হইলেও তাহাদের ভোগ মোক্ষার্থ সৃষ্টি প্রযোজন। সিদ্ধ পুরুষের সন্নিধি মাত্রেই প্রকৃতির উপর তাহার ঈশ্বরত্ব, তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, ও বদ্ধজীবের ভোগ

মোক্ষার্থ প্রকৃতির পরিণাম, তাহা হইতেই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ঈশ্বরত্বই সাংখ্য শাস্ত্র-সম্মত। যথা—

শাস্ত্রে আছে,

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
সৃজতে চ গুণান্ সর্ব্বান্ ক্ষেত্রজ্ঞস্বমু পশ্যন্তি।
গুণান্ বিক্রিয়তে সর্ব্বান্ উদাসীনবদীশ্বরঃ॥'

৫৮। প্রধানের স্বতঃ কোন ভোক্তৃত্ব নাই। পরের ভোগের জন্যই প্রধান নিজে সৃষ্টি করে। যেমন উষ্ট্র পর ভোগার্থ কুঙ্কুম বহন করে।

পূর্ব্বে স্বার্থ ও পরার্থ প্রধানের চেষ্টা, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে দেখান হইল যে, স্বার্থ চেষ্টা গৌণ। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ হইলে, সেই পুরুষ হইতে যে প্রকৃতির বিমুক্তি তাহাই প্রকৃতির স্বার্থ।

ভৃত্যের ন্যায় হইলেও প্রকৃতি যে পুরুষকে দুঃখ দেয়, তাহা হয় প্রকৃতি দুষ্ট ভৃত্য বলিয়া, না হয় তাহার কারণান্তর আছে। প্রকৃতিকে দুষ্ট ভৃত্য বলে না। গর্ভদাসবৎ প্রকৃতি পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ চেষ্টা করে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহার কারণান্তর আছে। সাধারণত পুরুষের ভোগেই প্রবৃত্তি হয়। এই ভোগ যখন পুরুষের নিকট দুঃখময় বোধ হয়, তখনই তাহার মোক্ষ জন্য প্রবৃত্তি হয়।

৫৯। অচেতন হইলেও প্রকৃতির চেষ্টা দুগ্ধের ন্যায়। দুগ্ধ যেমন বৎসের উপভোগ জন্য স্বতঃই ধাবিত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের পরিণত হয়।

যেমন দুগ্ধ স্বতঃই পুরুষ প্রযত্ন ব্যতীত দধি রূপে পরিণত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ মহদাদি রূপে পরিণত হয়। (বিঃ ভিঃ)।

পূর্ব্বরূপ অর্থ করিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। বিশেষ এস্থলে কর্ত্তৃত্বের বিচার হইতেছে।

এই স্থলে দুগ্ধের ন্যায় পরিণামের অর্থ বুঝিতে হইবে। গোবৎসের উপকারের জন্য যে গাভীর চেষ্টা বিনা, তাহার পালানে দুগ্ধ স্বতই তাহার রস রক্তাদি হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, বদ্ধ পুরুষের উপকার—অর্থাৎ ভোগ মোক্ষ জন্য প্রকৃতিও পুরুষের সান্নিধ্যে স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয়।

৬০। অথবা কালাদির কর্ম্ম যেমন দৃষ্ট হয়, এস্থলেও সেইরূপ হয়।

কৃষক বৃক্ষাদি রোপণ করিলে যথাকালে তাহা ফল প্রসব করে।

অনেক কর্ম্ম কাল বশতঃ সম্পন্ন হয়। সে সব স্থলে অচেতনের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। যথা—ঋতু পরিবর্ত্তন ইত্যাদি।

৬১। কিম্বা ভৃত্যের ন্যায় ফলাভিসন্ধান ব্যতীত স্বভাবতঃই প্রকৃতির চেষ্টা হয়।

উত্তম ভৃত্য যেমন অভিসন্ধি ব্যতিরেক অভিমান হীন হইয়া প্রভুর জন্য চেষ্টা-যুক্ত হয়, বিনা অভিসন্ধিতে স্বভাবতঃই সেইরূপ প্রধান চেষ্টা যুক্ত হয়।

উত্তম ভৃত্য স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ নিয়ত প্রভুর পরিচর্য্যা-পরায়ণ থাকে, নিজের ভোগ জন্য তাহার প্রবৃত্তি হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ চেষ্টা-যুক্ত। (বিঃ ভিঃ।)

পুরুষ অথবা সিদ্ধ ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠান মাত্র দ্বারা প্রকৃতির নিয়ন্তা হইলেও প্রকৃতি স্বতঃই সেই পুরুষ সান্নিধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। পুরুষ অকর্ত্তা, পুরুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং যে কিছু কর্ম্ম ও কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতিরই। প্রকৃতির এই কর্ত্তৃত্ব কিরূপে হয়, তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান হইতেছে। "কাল স্বভাব নিয়তি যদৃচ্ছা"র

ন্যায় (শ্বেতাশ্বত উপ ১১১) প্রকৃতির এই কর্ত্তৃত্ব, ইহাই এ স্থলে বুঝান হইয়াছে।

৬২। অথবা অনাদি কাল হইতেই প্রকৃতি কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট আছে।

সংসার অনাদি। ধর্ম্মাধর্ম্মাদির আকর্ষণে প্রধান অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম বশে অচেতন বৃক্ষেরও ফল জন্মে। কর্ম্মের প্রতি এইরূপ আকর্ষণ অনাদি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রকৃতি অনাদি কাল সৃষ্টি কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সেই কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অথবা, অনাদি কাল পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। পুরুষের সেই কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। (বিঃ ভিঃ।)

৬৩। প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য বোধ বা বিবেক হইলেই সেই পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি হয়। যেমন পাক সমাধা হইলেই পাকে নিবৃত্তি হয়।

শ্রুতিতে আছে,—"তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ।"

পর, বৈরাগ্য হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। তখন প্রকৃতি সেই পুরুষ সম্বন্ধে সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। তখন সেই পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতির মহা প্রলয় হয়। (বিঃ ভিঃ।)

বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন যে, পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে,পুরুষের নিমিত্তই প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব হয়। সেই পুরুষ মুক্ত হইলে প্রকৃতির সৃষ্টি প্রয়োজন আর থাকে না। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে ত আর প্রকৃতির সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব থাকে না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তখন সেই মুক্তপুরুষ সম্বন্ধেই প্রকৃতির সৃষ্টি ব্যাপার নিবৃত্তি হয়। যেমন পাকক্রিয়া শেষ হইলে পাচকের আর কোন কার্য্য থাকে না, সেইরূপ, পরবৈরাগ্য হইয়া পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলে, সেই পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি হয় ও প্রকৃতির অত্যন্ত লয় হয়। কিন্তু তখনও অন্য বদ্ধ-পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি ব্যাপার থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, যদি এক পুরুষের প্রকৃত মুক্তি হয়, তবে তাহা দ্বারা সকল বদ্ধ পুরুষের মুক্তি ও প্রকৃতির মহাপ্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু এ অর্থ সাংখ্যদর্শন-সম্মত নহে। তাহা পরের সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

৬৪। ইতর পুরুষ তাহার দোষেই ইতরের ন্যায় থাকে।

প্রকৃত বিবেক খ্যাতি না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত ধ্যান দ্বারা পুরুষ হইতে প্রধানকে ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে একেবারে পৃথক্ করা না যায়, সে পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না।

দোষ—অর্থাৎ প্রকৃতির চলত্বাদি দোষ। (অণিঃ)

প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্ পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সাধন করে। যে পুরুষের সম্বন্ধে সৃষ্টি নিবৃত্তি হয়,তাহার মুক্তি হয়। অন্য পুরুষ বদ্ধ থাকে। সুতরাং এক পুরুষের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয় না।

যাহার বিবেক জ্ঞান হয় নাই, সেই পুরুষ সাধারণ বদ্ধ পুরুষের ন্যায় প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ থাকে। প্রত্যেক পুরুষের প্রকৃতি, সেই পুরুষেরই অর্থ সাধন করে। যতক্ষণ সেই অর্থের অসমাপ্তিরূপ দোষ থাকে, ততক্ষণ সে পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি হয় না। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য সাধারণাৎ।

অতএব বিবেকী পুরুষের পক্ষেই প্রকৃতির নিবৃত্তি হয়। (বিঃ ভিঃ)

৬৫। প্রকৃতি পুরুষ এ উভয়ের অথবা ইহাদের মধ্যে একের ঔদাসীন্য হইলেই অপর বর্গ হয়।

বিবেকীকে আত্মপরিণাম না দেখানই প্রকৃতির ঔদাসীন্য, প্রকৃতির সম্বন্ধ বর্জ্জনই পুরুষের ঔদাসীন্য। (অনিঃ)

প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে ঔদাসীন্য বা বিয়োগেই পুরুষের মুক্তি। অথবা কেবল পুরুষের ঔদাসীন্য অর্থাৎ আমি মুক্ত হইলাম, এরূপ জ্ঞানের নাম মুক্তি। (বি. ভিঃ)

এ সূত্রে তিন প্রকারে মুক্তি বা অপবর্গ লাভের কথা আছে। যথা (১) প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য, (২) পুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃতির ঔদাসীন্য, এবং (৩) প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরুষের ঔদাসীন্য।

৬৬। প্রকৃতি বিবেকীর সম্বন্ধে সৃষ্টি বিরত হইলেও অবিবেকী সম্বন্ধে হয় না।

যেমন রজ্জুতে তত্বজ্ঞ পুরুষের সর্পভ্রম নিবৃত্তি হয়, অন্যের হয় না।

প্রকৃতি স্বভাবতঃ প্রবৃত্তিশীল, কেবল বিবেকীর নিকটই প্রকৃতি সে স্বভাব ত্যাগ করে, অন্যের কাছে নহে। (অনিঃ)

প্রকৃতি এক, ইহার কোন অংশ সৃষ্টি ব্যাপারে নিরত, কোন অংশ বিরত, তাহা বলা যায় না। তবে কোন পুরুষ বিবেক জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হইলে, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতি সৃষ্টির ব্যাপারে বিরত হয়, অন্যের অর্থাৎ বদ্ধের সম্বন্ধে হয় না।

উক্ত দৃষ্টান্ত স্পষ্ট বেদান্তের বিবর্ত্তনবাদ মত স্থাপক নহে।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃতি এক না বহু? কোন মতে প্রকৃতি বহু। অনন্ত সত্ত্ব, অনন্ত রজঃ, ও অনন্ত তমোগুণরূপ অনন্ত দ্রব্যের সমবায় মাত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি সত্ত্ব, কতকগুলি রজঃ ও কতকগুলি তমঃ দ্বারা কোন এক পুরুষের বন্ধনের তারতম্য অনুসারে সূক্ষ্ম দেহ সৃষ্টি হয়। অতএব প্রত্যেক বদ্ধ পুরুষের প্রকৃতি এক অর্থে ভিন্ন। সেই পুরুষের মুক্তিতে তাহারই প্রবৃত্তি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্তি হয়। অন্য বদ্ধপুরুষ সম্বন্ধে তাহার প্রকৃতি প্রবৃত্ত থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, এ মত সঙ্গত নহে। প্রকৃতি একই। বহু পুরুষ সম্বন্ধে সেই একই প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন একই ভৃত্য বহু জনের বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে। একের অর্থ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে সে যেমন আর তাহার কর্ম্ম করে না, কেবল যাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই, তাহাদেরই প্রয়োজন সাধন করিতে থাকে, সেইরূপ, একই প্রকৃতি তাহার অবসানে সূক্ষ্ম শরীর উৎপাদন করিয়া, প্রতিপুরুষের সূক্ষ্ম শরীরকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, সকলেরই প্রয়োজন সাধন করে। কেবল সে মুক্ত পুরুষের প্রয়োজন সাধন সম্বন্ধে বিরত হয়।

৬৭। আর কর্ম্মরূপ নিমিত্ত যোগ হেতুও সৃষ্টি থাকে।

এই সূত্রে বিজ্ঞানভিক্ষুর পাঠ "নিমিত্ত যোগাৎ।" আর অনিরুদ্ধের পাঠ—"নিমিত্তা-যোগাৎ।" অনিরুদ্ধ অর্থ করেন, বিবেকী সম্বন্ধে কর্ম্মরূপ নিমিত্ত যোগ থাকে না। কাজেই প্রকৃতি তাহার সম্বন্ধে সৃষ্টি করে না।

বিজ্ঞান-ভিক্ষুর পাঠ অনুসারে অর্থ এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত তাহার যোগ থাকাকেই প্রকৃতি সেই অবিবেকী পুরুষের জন্য সৃষ্টি-নিরত থাকে।

বিবেকীর পক্ষে সেই নিমিত্ত রূপ কর্ম্মযোগ থাকে না। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের শুভ শুভ কর্ম্ম সৃষ্টির কারণ। সেই কারণ যোগেই প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। যতদিন শুভাশুভ কর্ম্ম বন্ধন থাকে ততদিন সেই কর্ম্মই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ।

শাস্ত্রেও আছে —

“ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।”

৬৮। আর নিরপেক্ষ হইলেও প্রকৃতি অবিবেক নিমিত্ত উপকারক হয়।

এই প্রকৃতির কার্য্যের জন্য কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকিলেও অবিবেকের অপেক্ষা আছে। অবিবেক স্বতন্ত্র নয়। কারণ অদৃষ্ট বা কর্ম্ম তাহার সহকারী কারণ। (অনিঃ)

পুরুষ নিরপেক্ষ হইলেও “পরমাত্মার স্বামী” এইরূপ অবিবেক বশতঃ সৃষ্টি দ্বারা পুরুষের উপকার করে।

পুরুষ নিরপেক্ষ। কারণ তাহার জন্য সৃষ্টি করিতে বা সৃষ্ট হইতে বিরত হইতে প্রকৃতিকে অনুরোধ করেন না। অবিবেকই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি সাধারণ ভাবে সৃষ্টি করে। তাহার নিকট পুরুষ বিশেষ বলিয়া বিশেষ বিবেচনা নাই। সে পুরুষের নিকট আত্ম প্রদর্শন করিতে চাহে। এই অবিবেক নিমিত্তই সৃষ্টি হয়। (বি, ভিঃ)

৬৯। প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় প্রবৃত্ত হইলেও চরিতার্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়।

যেমন নর্ত্তকী পুরুষগণকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াও নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ নিবৃত্তি হয়। (অনিঃ)

পুরুষের জন্যই প্রকৃতি প্রবৃত্তিস্বভাব। পুরুষার্থ সাধন হইলেই প্রকৃতি চরিতার্থ হয়। যেমন, দর্শকগণের নৃত্য দর্শন লালসা নিবৃত্ত হইলেই নর্ত্তকী নিবৃত্ত হয়। অতএব যে কার্য্য সাধন নিমিত্ত যাহার প্রবৃত্তি, তাহা সাধিত হইলেই সে প্রবৃত্তির অন্তর্হিত হয়। সুতরাং প্রবৃত্তি-স্বভাবা প্রকৃতির নিবৃত্তি অসম্ভব নহে। (বিঃ ভিঃ)।

৭০। আর দোষবোধেও প্রকৃতি কুলবধূর ন্যায় পুরুষের সমীপবর্ত্তী হয় না।

কুলবধূ যেমন দোষবোধে পর পুরুষের সমীপবর্ত্তী হয় না, সেইরূপ, পুরুষ প্রকৃতির দোষ বোধ করিলে প্রকৃতি আর তাহার সমীপবর্ত্তী হয় না। (অনিঃ)

• যেমন স্বামী স্ত্রীকে দোষী স্থির করিলে লজ্জায় সে স্বামীর নিকট যায় না, সেইরূপ প্রকৃতিও পরিণামাত্ম দুঃখাত্মকাদি দোষযুক্ত রূপে পুরুষের নিকট প্রতিপন্ন হইলে, আর পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয় না।

“সবিকারা প্রকৃতিং চিৎ, মুক্তা ও স্থূলা।
প্রকৃতিজ্ঞাতৃদ্যাং ন লজ্জাদের নিবর্ত্ততে।”

—নারদাদি কারিকায় আছে—

“প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতি ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।
(বিঃ ভি)

৭১। অবিবেকতা ব্যতীত পুরুষের একান্ততঃ (বাস্তবিক) বন্ধন বা মোক্ষ হয় না।

পুরুষের বন্ধন, অভিমান জন্য। তাহা সত্য নহে, বা তাহা তত্ত্ব নহে। অতএব দুঃখযোগ বিয়োগরূপ বন্ধন মোক্ষদ্বারা পুরুষের কোন পরিণাম হইতে পারে না। (৩৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।)

৭২ প্রকৃতির গুণযোগ হেতু

ও সসঙ্গত্ব হেতু পশুবৎ বন্ধন মোক্ষ হয়।

পশু যেমন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হয়, এবং রজ্জু মুক্ত হইলেই মুক্ত হয়, সেইরূপ, পুরুষ ও প্রকৃতির ত্রিগুণের সহিত যোগের দ্বারা ও সেই গুণের সহিত সঙ্গত্ব হেতু বদ্ধ হয়।

অথবা পুরুষ বদ্ধ হয় না। প্রকৃতিই বদ্ধ হয়।

পুরুষ প্রকৃতির সেই বন্ধন আপনাতে আরোপ করে মাত্র। ইহাই অবিবেক। ইহাতে পুরুষের স্বভাব প্রচ্যুতি দোষ হয় না। (সসঙ্গ—দুঃখসাধন ধর্ম্মাদি বা ত্রিগুণযুক্তত্ব।) কারিকায় আছে—

তস্মান্নবদ্ধতেঽদ্ধান মুচ্যতে বাপি সংসরতে পুরুষঃ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।

পূর্ব্বের ৬৫ সূত্রের সহিত এস্থলে বিরোধ নাই।

৭৩। কোশকারের (গুটীপোকার) ন্যায় প্রধান আত্মাকে সাতরূপে বদ্ধ করে, আর একরূপে বিমুক্ত করে।

বুদ্ধি অষ্টবিধ, যথা—জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য। ইহার মধ্যে শেষ সাতরূপে বুদ্ধি আত্মাকে বদ্ধ করে, কেবল জ্ঞানরূপ দ্বারাই মুক্ত করে। (অনিঃ)

বুদ্ধি যতক্ষণ ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিভিন্ন আকারে বা ভাবে থাকে, ততক্ষণ তাহা আত্মাকে বদ্ধ করে, আর যখন কেবল একভাবে—জ্ঞানাকারে থাকে, তাহার বিভিন্ন আকার দূর হয়—তখন পুরুষ মুক্ত হয়। (বিঃ ভিঃ)

গুটিপোকা আপনিই আবাসরূপ কোশ নির্ম্মাণ করিয়া যেমন তাহাতে বদ্ধ হয়, সেইরূপ, পুরুষও অবিবেক হেতু বুদ্ধির এই ধর্ম্ম বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই সাত রূপ দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করে। আর গুটিপোকা যে প্রজাপতি হয়, নিজে সেই গৃহ ভেদ করিয়া উড়িয়া যায়, পুরুষও সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা এই বদ্ধ গৃহ ভেদ করিয়া মুক্ত হয়। কারিকায়ও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৪। অবিবেকই বন্ধনের নিমিত্ত কারণ। এজন্য দৃষ্টান্ত হানি হয় না।

(শাস্ত্রে কর্ম্মের দ্বারা ভোগ ও মোক্ষের কথা আছে। মোক্ষে, কর্ম্ম পরম্পরা, কারণ, তাহা জ্ঞান উৎপাদন করে মাত্র। কর্ম্ম ভোগেরই মুখ্য কারণ। এজন্য কর্ম্মকে ত্যাগ করায় দৃষ্টান্ত হানি হয় না। (অনিঃ)

সাধারণতঃ লোকে দেখা যায়, দুঃখই হেয়, আর সুখ উপাদেয়। অবিবেক হেয় বা উপাদেয় নহে। অবিবেকই বন্ধন নহে। তাহা বন্ধনের নিমিত্ত কারণ মাত্র। এই অবিবেক রূপ নিমিত্ত কারণ হইতেই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হয়। তাহা হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাহাই পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। তাই পুরুষে দুঃখ সম্বন্ধ হয়। এই দুঃখের হেয়ত্ব ও সুখের উপাদেয়ত্ব স্বীকার না করিলে দৃষ্টান্ত হানি হয় না। অবিবেকই যে বন্ধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। অবিবেককে বন্ধনের নিমিত্ত কারণ মাত্র বলা হইয়াছে। যাহা হউক, এই দুঃখ সম্বন্ধ নিবৃত্তিই মোক্ষ। তত্ত্বজ্ঞান হইতেই এই মোক্ষ হয়।

৭৫। তত্ত্ব অভ্যাসদ্বারা, ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে ত্যাগদ্বারা বিবেক সিদ্ধি হয়।

অর্থাৎ যে তত্ত্ব প্রথম অধ্যায়ে ৭ হইতে ৬০ সূত্রে বিবৃত হইয়াছে—সেই পুরুষ হইতে ভিন্ন প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি বিষয়ক যে

সাংখ্যের পঞ্চবিধ শক্তিতত্ত্ব, তাহা অভ্যাস ও পুনঃ পুনঃ যত্ন পূর্ব্বক আলোচনা দ্বারা এবং আমি পুরুষ, -জড় পঞ্চভৌতিক শরীর নহি. বা প্রকৃতি ও বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় বা পঞ্চতন্মাত্র নহি, এবং প্রকৃতি নহি, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা পুরুষ প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধি হয়।

শ্রুতিতে আছে, "স এষ নেতি নেতীতি আত্মা গ্রাহ্যেন হি গৃহ্যতে আশীর্য্যোন হি শীর্য্যতে।" (অণিঃ)

জড় হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থেই তন্ন তন্ন রূপে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিলে বিবেক নিষ্পন্ন হইবে। আমি স্থূলদেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, আমি ইহার কিছুই নহি—এইরূপ ক্রমে ক্রমে স্থির করিয়া অভ্যাস নিবৃত্তি করিতে হইবে। আত্মা পৃথিবী আদি কোন ভূত নহে, তাহা তন্মাত্র নহে—ইত্যাদিরূপে তত্ত্বাভ্যাস করিলে বিবেক নিষ্পত্তি হয়। শ্রুতিতে আছে—

অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরং অস্তি স এষ আত্মা, নেতি নেতি । অন্যত্র আছে,—

"অব্যক্তাদবিশেষান্তে বিকারেঽস্মিংশ্চ বর্ণিতে।
চেতনাচেতনান্যত্ব জ্ঞানেন জ্ঞানমুচ্যতে॥"

কারিকায় আছে—

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

এইরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্ব, সঙ্গত্ব, তাদাত্ম্য নিষেধ হইয়াছে।

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়"—এই যোগসূত্র দ্রষ্টব্য। (বিঃ ভিঃ।)

৭৬। অধিকারী ভেদ থাকায় বিবেক সিদ্ধির (কাল) নিয়ম নাই।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অধিকারী, তিন রূপী, যথা—মৃদু, মধ্য, তীব্র। প্রত্যেকের আবার তিন বিভাগ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ অধিকারী ভেদ নয় প্রকার।

অধিকারীর সাধারণ বিভাগঃ—উত্তম, মধ্যম ও অধম।

তত্ত্বাভ্যাস করিলেও অধম অধিকারীর বিবেক সিদ্ধি হয় না।

৭৭। মধ্য বিবেক হইতে কর্ম্ম বীজ বাধিত হইলেও তাহার অনুবৃত্তি হয়।

মন্দবিবেকীর আত্ম-সক্ষাৎকার হয় না। তাহার প্রবল মননাদির অবস্থা থাকে। মধ্য বিবেকীর আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া দুঃখাদির বাধ হয় বটে, কিন্তু তাহার পূর্ণ বিবেক না হওয়ায় দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। মধ্য বিবেকীর সম্প্রজ্ঞাত সমাধি মাত্র হইতে পারে। তাহার ব্যুত্থান কালে দুঃখ বাধিত হইয়াও পুনর্ব্বার আত্মাকে প্রতিবিম্বিত করে। এই জন্য তাহার ভোগ নিবৃত্ত হয় না। কেবল তীব্র বিবেকীর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগে বিবেক নিষ্পত্তি হইলে তাহার আর ভোগ হয় না। (বিঃ ভিঃ)।

৭৮। জীবন্মুক্তও এইরূপ।

রাগের অভাব হইলে জীব মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরং অনুসংজ্বরেৎ॥"

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, জীবন্মুক্তেরা মধ্য বিবেকী। মূল সূত্রের 'চ' অর্থে জীবন্মুক্তেরা মধ্য বিবেকীর ন্যায়।

৭৯। উপদেশ্য উপদেষ্টৃত্ব হইতে তাহা সিদ্ধ হয়।

তীব্র বিবেকীরা উপদেষ্টা হইতে পারেন না। তাঁহাদের উপদেশের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের বাহ্য সংবেদনা থাকে না। অজ্ঞানী মন্দ বিবেকীর উপদেশে ফল হয় না। সেও উপদেষ্টা হইতে পারে না। কেবল মধ্য বিবেকীই উপদেষ্টা উপদিষ্ট হইতে পারে। অতএব তাহারই সিদ্ধিতে জীবন্মুক্তি সিদ্ধি হয়। (অণিঃ)

শাস্ত্রে আছে, গুরু শিষ্য ভাবে বিবেক জ্ঞান প্রবল হইতে জীবন্মুক্তি সিদ্ধি হয়। জীবন্মুক্তই উপদেষ্টা হইতে পারেন। (বিঃভি)

৮০। শ্রুতিতেও এইরূপ আছে।

শ্রুতিতে আছে—

"জীবন্নেবহি বিদ্বান্ হর্ষয়াসাভ্যাং বিমুচ্যতে।"

(শ্রুতি)

অন্যত্র আছে,—

"ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি।"

স্মৃতিতে আছে,—

"দীক্ষয়ৈব নরো মুচ্যেৎ তিষ্ঠেন্ মুক্তোঽপি বিগ্রহে।
কুলাল চক্র মধ্যস্থো বিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমদ্ঘটঃ॥"
পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যে ন লোকো ন চ বৈদিকঃ।
অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।"

ইতি নারদীয় স্মৃতি।

৮১। অন্যথা (অর্থাৎ মন্দ বিবেকীর উপদেষ্টা হইলে) অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ের মত হয়।

গুরু ও শিষ্য—অজ্ঞানী হইলে সে স্থলে অন্ধ দ্বারা অন্ধকে পথ দেখানের ন্যায় হয়। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহে, তাহারা শিষ্যকে ভ্রান্ত উপদেশ দিবে। সে শিষ্য আবার অন্যকে ভ্রান্ত উপদেশ দিবে, এইরূপ পরম্পরা চলিবে।

৮২। জীবন্মুক্তেরা চক্র ভ্রমণবৎ শরীর ধারণ করেন।

জীবন্মুক্ত জ্ঞান লাভ করিলেও সদ্য মুক্ত হয় না। যেমন কুম্ভকার দণ্ড দ্বারা চক্র ঘুরাইয়া দেয়। পরে সে দণ্ড সরাইয়া লইলেও চক্র ঘুরিতে থাকে। সেইরূপ জীবন চেষ্টা না থাকিলেও প্রারব্ধ সংস্কার বশে (Inertia হেতু) জীবন্মুক্তের জীবন থাকে। যতক্ষণ সে প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ তাহার শরীর থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"কুলাল চক্র মধ্যস্থোঽবিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমেদ্ ঘটঃ।"

৮৩। সংস্কার লেশ থাকায় তাহা সিদ্ধ হয়।

অর্থাৎ যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ শেষ না হয়, ততদিন সেই কর্ম্ম সংস্কারের শেষ মনে থাকা পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তের শরীর থাকে।

"ব্যুত্থান নিরোধ" সংস্কারয়োরভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ পরিণামঃ।"— এই পাতঞ্জল যোগসূত্র হইতে জানা যায় যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও বাসনা ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই সমাধি অবস্থায় বাসনার বিকাশ থাকে না। বলিতে পারা যায় যে, শরীর ধারণ হেতু যে সকল সংস্কার—সম্প্রজ্ঞাত যোগে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয় না, যে অবিদ্যাই জন্মাদির হেতু। (পাঃ দঃ) তাহার অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে,তাই শরীর থাকে। এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। কেননা অবিদ্যার লেশ থাকিলেও ভোগ হইবে ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি উৎপন্ন হইবে। অজ্ঞান বীজবৎ থাকিয়া যাইবে, অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবন্মুক্তের অবিদ্যার লেশও থাকে না, তাহার দেহ দগ্ধ বস্ত্রাবভাসের ন্যায়। তবে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ না হইলে ক্ষয়

হয় না। এ জন্য তাহার শেষ থাকে। (বিঃ ভিঃ)

৮৪। বিবেক হইতে নিঃশেষ রূপে দুঃখ নিবৃত্তি হইলে কৃতকৃত্যতা হয়। আর কিছুতে হয় না।

বিবেকের পূর্ণ পরিপাকেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, কৃতকৃত্য হওয়া যায়। তাহাতেই পরামুক্তি হয়। অন্যরূপে তাহা হয় না। (অণিঃ)

কেবল জীবন্মুক্ত হইলেই পরামুক্ত হয় না। পরামুক্তির অন্য নাম কৈবল্য, বিদেহমুক্তি বা নির্ব্বাণ।

বিবেক সিদ্ধি হইতে, পরাবৈরাগ্য দ্বারা সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ ফলে, নিঃশেষরূপে বাধিত অবাধিত নিখিল দুঃখ নিবৃত্তি হইবে। তখনই পুরুষ কৃতকৃত্য হইবে।

আর কিছুতে—অর্থাৎ জীবন্মুক্তি পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। (বিঃ ভিঃ)

তৃতীয় অধ্যায়—সূচীপত্র।

বিষয়।	সূত্র সংখ্যা।
১। শরীর উৎপত্তি	১—৫
২। শরীর দুই রূপ	৬—৭
৩। লিঙ্গ শরীর	৮—১০
৪। তাহার অধিষ্ঠান	১১—১৩
৫। লিঙ্গ শরীর—কার্য্য	১৪—১৫
তাহার গতি	১৬
৬। স্থূল শরীর	১৭—১৯
চৈতন্য-দেহের ধর্ম্ম নহে	২০—২২
৭। জ্ঞান হইতে মুক্তি	২৩
(ক) বিপর্য্যয় হইতে বন্ধন জ্ঞানই মুক্তির মুখ্য কারণ	২৪
(খ) কর্ম্ম উপাসনা, সঙ্কল্প মুক্তির মুখ্য কারণ নহে	২৫-২৮
৮। ধ্যান—	
ধ্যানের উপায়, ধ্যানের অঙ্গ	২৯—৩৬
৯। বিপর্য্যয় ভেদ	৩৭
১০। অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধির ভেদ ও অবান্তর ভেদ	৩৮—৪৪
১১। সিদ্ধির উপায়	৪৫
১২। সৃষ্টি—	
দেহাদি ভেদ	৪৬—৪৭
কারণাদি ভেদ	৪৮—৫১
সৃষ্টি হেয়	৫২—৫৩
১৩। প্রকৃতির অবস্থা হেয়	৫৩
১৪। প্রকৃতিলীন পুরুষ (সাংখ্যের জন্য ঈশ্বর) সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ	৫৪—৫৭
১৫। প্রকৃতি হইতে স্বতঃ সৃষ্টি	৫৮—৬২
১৬। সৃষ্টি নিবৃত্তি ও সৃষ্টি প্রবৃত্তি	৬৩—৭০
১৭। অবিবেক ফল বন্ধন	৭১—৭৪
১৮। বিবেক সিদ্ধির উপায় জ্ঞান-সাধনা	৭৫
১৯। অধিকারী ভেদ	৭৬—৭৭
২০। জীবন্মুক্তির অবস্থা	৭৮—৮৪

—০—

তৃতীয় অধ্যায়—সারসংগ্রহ।

(ক) শরীরতত্ত্ব

১। লিঙ্গ ও অধিষ্ঠান শরীর ১—৬

(খ) বন্ধন তত্ত্ব।

১। সৃষ্টিভেদ ১২

২। সৃষ্টি হেয় ১৩

৩। প্রকৃতি লীনের সহিত সৃষ্টের সম্বন্ধ ১৪

৪। প্রকৃতি হইতে স্বতঃ সৃষ্টি ১৫

৫। সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ১৬

(গ) বন্ধন কারণ		
১। বিপর্য্যয়, অশক্তি ইত্যাদি ৭ (ক) ৯।১০		
(ঘ) মুক্তির উপায়।		
১। জ্ঞান সাধন	৭ (ক)	
গৌণ কারণ	৭ (খ)	
২। ধ্যান	৮	
৩। তুষ্টি	১৭	
৪। সিদ্ধি	১০	
৫। প্রকৃতি লক্ষ	১৪	
৬। বিবেক	১৮	
৭। অধিকারী ভেদ	১৯	
৮। জীবন্মুক্তি	২০	

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

ব্রাহ্মসমাজ, ভারত ও জগতের উন্নতি।

ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে চিন্তা করিলে, বুঝা যায় যে, ভারতের উন্নতি ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি, এক সূত্রে গাঁথা। ভারতের উন্নতি যাহাতে, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিও তাহাতে। একটী একটী করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথম, একতা ভিন্ন ভারতের উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু সেই একতা কেমন করিয়া হইবে? ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, কত প্রকার ভেদ। ইহাতে কেমন করিয়া একতা হইবে? কে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক করিবে? ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে কে এক জাতি করিবে? ইহার কেবল এক উত্তর সম্ভব। ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহা করিতে পারে। আর কিছুতেই পারেনা। ভারতের পক্ষে যে একতা বন্ধনে বদ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ কি চান? ব্রাহ্মসমাজ ইহাই চান যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি নষ্ট হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত। এই মত মানিতে হইলে জাতিভেদ থাকা অসম্ভব। কেবল মুখে ভাই বলিলে কি ভ্রাতৃত্ব হয়? কার্য্যে ভ্রাতৃত্ব হওয়া চাই। মুখে ভাই বলিব, অথচ এক সঙ্গে আহার করিব না। মুখে ভাই বলিব, অথচ পরস্পর আদান প্রদান করিব না। ইহাতে কি ভ্রাতৃত্ব হয়? জাতিভেদ থাকিতে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব কখনই সম্ভব নহে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইলেই দেশে যথার্থ ভ্রাতৃভাব আসিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এই চান যে, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না থাকে। সেই আদর্শ যদি ভারতের বিভিন্ন জাতি সকলের মধ্যে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে, ভারত এক জাতি হইতে পারে। যতদিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি বাস করিবে, ততদিন জাতীয় একতা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজের আর একটী উদ্দেশ্য এই যে, নর নারীর সমান অধিকার। এই উদ্দেশ্য যদি দেশের লোক বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে, স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা থাকে না। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা যে কত, তাহা বর্ণনা করিয়া বলা অসম্ভব। হৃদয়বান লোক স্ত্রীজাতির অবস্থা বিষয়ে চিন্তা করিলে যথার্থই কাতর হইয়া উঠেন। নানা প্রকারে এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। বিশেষ করিয়া বর্ণনা কি আবশ্যক? বাল্য-

বিবাহ, বহু-বিবাহ, চিরবৈধব্য, স্ত্রীজাতির দেশব্যাপী মূর্খতা, ইত্যাদি নানা কারণে স্ত্রীলোকেরা যে কষ্ট সহ্য করে,তাহা চিন্তা করিলে প্রাণ কাতর হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মসমাজই স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু। ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীজাতির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে, পরমেশ্বরকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন, তাহার তো কথাই নাই, আর যখন ভাবি, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা স্ত্রীজাতির মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতে কি হইবে, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা বিধান করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীজাতির উপযুক্ত বয়সে বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীজাতিকে বহুপত্নীকের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ চিরবৈধব্যরূপ যন্ত্রণা হইতে স্ত্রীজাতিকে পরিত্রাণ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই সকল হিতকর কার্য্য স্মরণ করিলে যথার্থই ব্রাহ্মসমাজের মাহাত্ম্য ও পরমেশ্বরের কৃপা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া বিগলিত-হৃদয় হইতে হয়।

যতই ভারতের নানা প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ সুসমাচার প্রচারিত হইবে, ততই ভারতের মঙ্গল।

তৃতীয়, ব্রাহ্মসমাজের আর একটী উদ্দেশ্য এই যে, সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করা; এক পরমেশ্বরের পতাকার নিম্নে সকলকে আনয়ন করা। এই মহৎ কার্য্য, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে, আর সকলই সহজে হইয়া যাইবে। এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার, ব্রাহ্মসমাজের মূল কার্য্য। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে, সমাজের অন্যান্য কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইবে। পৌত্তলিকতা বিনাশ, বহু দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে এক পরব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত করা, ব্রাহ্মসমাজের এই মহৎ কার্য্য। এই কার্য্যের ফল যাহা হইবে, তাহাতে সমগ্র ভারত বিশেষ রূপে উপকৃত হইবে। এক পরব্রহ্মের উপাসনা যখন সমগ্র ভারতবাসীর উপাসনা হইবে, তখন দেশের প্রকৃত মঙ্গলের দিন আসিবে।

চতুর্থ, ব্রাহ্মসমাজের এই একটী বিশেষ উদ্দেশ্য যে, সকল শ্রেণীর লোককে একসূত্রে গ্রথিত করা। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, সম্ভ্রান্ত, সাধারণ, এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যাহাতে এক ধর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ হইয়া একত্রীভূত হইতে পারেন, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। এখন দেশের মধ্যে যে নানা বিভাগ ও তজ্জনিত অসম্মিলন, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মই দূর করিতে পারেন। এ বিষয় আমাদের বিশেষ যত্ন চাই। সকলেই যখন পরমেশ্বরের সন্তান, তখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা, কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধনবান লোক দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহাদের অবস্থা যাহাতে ক্রমে ভাল হয়, এমন চেষ্টা করিবেন, যাহাতে জগতের মূর্খতা দূর হয়, বিবিধ উপায়ে সে চেষ্টা হইতে পারে। সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাধারণ লোকের এখন অত্যন্ত দূরত্ব রহিয়াছে, পরস্পর কোন সম্বন্ধই নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই দূরত্ব দূর করিবেন। যখন ব্রাহ্ম দেখিবেন যে, যে ব্রহ্ম তাহাতে জীবাত্মা রূপে প্রকাশিত, তিনিই অন্য সকল লোকের মধ্যেও জীবাত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তখন তিনি আপনাকে অন্য সকল লোক হইতে কখনই দূরে রাখিতে পারিবেন না। যখন মানুষ দেখে যে, তিনি যে ব্রহ্মেরই সন্তান, অন্য সকলেও সেই ব্রহ্মেরই সন্তান, তখন অন্যের প্রতি

ভাই বলিয়া স্বভাবতঃ প্রেমের সঞ্চার হইবেই হইবে। যিনি আমাতে, তিনিই সকল মানবে। এই জ্ঞান থাকিলে, মানুষ কখনও আপনাকে অন্য হইতে দূরে রাখিতে পারেনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম, মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রকৃত সম্বন্ধ দেখাইয়া দিয়া পরস্পরকে এক করিবে। পাপী হউক, বা পুণ্যাত্মা হউন, ধনবান হউন, বা দরিদ্র হউন, পণ্ডিত হউন বা নিরক্ষর হউন, সকলেই এক মাতা পিতার সন্তান। তবে তাঁহারা কেন বিচ্ছিন্ন থাকিবেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকে এক প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিবে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য।

পঞ্চম, জাতিভেদ গিয়া আমরা সকলে একজাতি হইব। সমগ্র ভারত এক হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই মহা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ভারত কখনই এক জাতি ছিলনা। কিন্তু এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন এক ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভারত এক জাতি হইবে। এখনই তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন মাদ্রাজ-বাসী ও পঞ্জাববাসী, বোম্বাইবাসী ও বাঙ্গালা-বাসী, সকলেই ব্রাহ্ম হইয়া এক ধর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পর এক হইতেছেন। ইহা নিশ্চয় যে, দূর ভবিষ্যতে এই রূপে সকল ভারত এক হইবে। প্রথমে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এক হইবে, তার পর তাঁহাদের প্রভাবে ক্রমে সাধারণ লোকও এক হইবে।

ষষ্ঠ, ব্রাহ্মসমাজের আর এক কাজ এই যে, সাম্প্রদায়িক ভাব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করা। ব্রাহ্মধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য দেখিতে পান। সেই জন্য, যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা করেন না। উপযুক্ত কালে, উপযুক্ত অবস্থায়, উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষার গুণে, এক কথায়, উপযুক্ত দেশ কাল, পাত্র অনুসারে, প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে সকল ধর্ম্মের প্রকাশ। সুতরাং যিনি জ্ঞানী ব্রাহ্ম, তিনি কোন ধর্ম্মকেই অশ্রদ্ধা করেন না, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই বিধাতার হস্ত দেখিতে পান। ইহা নিশ্চয় যে, তিনি এমন বলেন না যে সকল ধর্ম্মই সত্য, ইহাই বলেন যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে সত্য আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জন করিয়া তাহাতে যাহা সত্য আছে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ যেমন হইতেছে ও হইবে, এমন আর কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের দ্বারা হইতে পারেনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে এই এক মহা মঙ্গল আনয়ন করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা জগতের যে অনিষ্ট হইয়ছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইতিহাস এ বিষয়ে শতকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিতেছেন। এমন পাপ নাই, যাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ যে নরহত্যা, তাহা মানুষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্য ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম যে কত অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার গণনা অসম্ভব। মানুষকে এমন যন্ত্রণা দিয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপ করা হইয়াছে যে, ইতিহাস পুস্তকে তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, অজস্র ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সকল দেশেই এ প্রকার অত্যাচার। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বশতঃ মানুষ, মানুষকে যেরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহার তুলনা অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না। এস্থলে আমরা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহারা এ বিষয়ের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম এই মহা পাপকে পৃথিবী হইতে বিদূরিত করিবেন। অন্য কোন ধর্ম্মের দ্বারা একার্য্য হইবে না। কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মত যে, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, সকল ধর্ম্মেই বিধাতার হস্ত রহিয়াছে, সকল ধর্ম্মের দ্বারাই অল্প বা অধিক পরিমাণে জগতের মঙ্গল হইতেছে। পরিণামে সকল ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ মহাধর্ম্মের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সকল ধর্ম্মের যাহা ভ্রমপ্রমাদ, তাহা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল সত্য রহিয়াছে, তাহা কখনই বিনষ্ট হইবার নহে, তাহা, এক মহাসমুদ্রে নদ নদী সকলের মিলনের ন্যায়, এক মহা সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া একীভূত হইয়া যাইবে। জয় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়। জয় জগদীশ্বরের জয়।

সপ্তম, আর একটী বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য এই যে, ধর্ম্ম ও নীতিকে এক করা। কোন ধর্ম্মেই ধর্ম্ম ও নীতি সম্পূর্ণ এক নহে। ইহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মে। অন্যান্য ধর্ম্মে ধর্ম্ম ও নীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কতকগুলি বিশেষ কার্য্যকে লোকে ধর্ম্ম মনে করে। যেমন, গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা, দোল, দুর্গোৎসব, মাতা পিতার শ্রাদ্ধ, প্রাত্যহিক আহ্নিক পূজা, ইত্যাদি কার্য্যকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু সত্যবাক্য, ন্যায়পরতা, চরিত্রের পবিত্রতা, দীন দুঃখীকে দয়া, ইত্যাদি কার্য্যকে সে পরিমাণে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয় না। যিনি দোল দুর্গোৎসবে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন, তিনি একজন বিপন্ন ভদ্রলোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পাঁচটী টাকা ব্যয় করিতে হয়তো কষ্টবোধ করিবেন। যিনি ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য রাশি রাশি অর্থবিসর্জ্জন করিবেন, তিনি চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য লেশমাত্র যত্ন করিবেন না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, হৃদয়ের বিশুদ্ধতা, সত্যপরায়ণতা, এই সকল যে প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা লোকে বুঝে না। কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানকেই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানে তাহারই অনুষ্ঠানে অধিকতর অনুরাগ। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র যত্ন করে না, সে অক্লেশে কোন কোন বাহ্য অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয় মনে করিবে। যিনি দৈনিক পূজা আহ্নিকে বিশেষ ভাবে নিষ্ঠাবান, তিনি হয়তো আদালতে একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে অনায়াসে মিথ্যা সাক্ষ্যের আয়োজন করিবেন। আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের এই অবস্থা। এসকল কথা অভ্রান্ত সত্য। একজন বিধবা বিবাহ করিলে বা যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলে সমাজচ্যুত হইবে, কিন্তু কোন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে কখনই তাহা হইতে হইবে না। যে ব্যক্তি শত শত নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছে, সে অনায়াসে সমাজে স্থান পায, কিন্তু প্রকাশ্য-রূপে যবনান্ন বা শূদ্রান্ন গ্রহণ করিলে কেহ সমাজে স্থান পাইবে না। ইহাতেই কি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে না যে, লোকে নীতিকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে না? কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে? ইহাই হিন্দু সমাজের অধোগতির একটী প্রধান কারণ। সত্যপরায়ণতা, ন্যায়পরতা, দয়া, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-দমন, এই সকল যে প্রকৃত-ধর্ম্ম, ইহা লোকে বুঝে না। গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ, লোকের নিকট এই সকলই ধর্ম্ম। অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া কোন বাহ্য অনুষ্ঠান করিলেই লোকে মনে করেন যে, সকল পাপ দূর হইল। নীতি যে ধর্ম্মের মূল, নীতি ভিন্ন যে ধর্ম্ম হয় না, লোকের এ জ্ঞান নাই।

কেবল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেরই যে এইভাব, এমন নহে। অন্যান্য সকল ধর্ম্মেরই এই অবস্থা। মুসলমান ধর্ম্মের অবস্থা কি? ইহাতে কি নীতির সম্পূর্ণ আদর আছে? কখনই নহে। ইহাতেও কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান প্রকৃত ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া আছে, নীতির আদর নাই। যে পরিমাণে কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের আদর, সে পরিমাণে নীতির আদর নাই। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে যে, মুসলমান ধর্ম্মে নীতির আদর নাই। উপবাস দ্বারা ধর্ম্মসাধন যত প্রয়োজনীয় মনে করেন, সত্য ও ন্যায় ব্যবহার, এবং পরোপকারদ্বারা ধর্ম্ম সাধন সে পরিমাণে কখনই আবশ্যক মনে করেন না। মহরম করিয়া ধর্ম্ম করা যত আবশ্যক মনে করেন, চরিত্রের পবিত্রতা, দয়া, সত্য ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মাচরণ সে পরিমাণে কখনই আবশ্যক মনে করেন না।

এখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কথা বলিব। সকলেই জানেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম নীতিপ্রধান। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্ম্মও কি নীতিকে উপযুক্ত স্থান প্রদান করেন? জলাভিষেক দ্বারা দীক্ষিত হওয়া যত আবশ্যক মনে করা হয়, হৃদয়ের নির্ম্মলতা কি সেই পরিমাণে আদরণীয়? প্রভুর ভোজে রুটি ও সুরা গ্রহণ করা যে পরিমাণে পবিত্র ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া মনে করা হয়, সত্য ব্যবহার, ন্যায়াচরণ, পরোপকার কি সেই পরিমাণে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা হয়? জীবনের পবিত্রতা যে পরিমাণে আবশ্যক, উপরোক্ত আচরণগুলি কি তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় নহে? মহাত্মা থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে, প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যাওয়া, নিয়মিত রূপে বাইবেল পাঠ করাকে যেমন লোকে ধর্ম্ম মনে করে, ব্যবসায়ে সত্যরক্ষা করা সে পরিমাণে ধর্ম্ম মনে করে না।

সকল ধর্ম্মেরই এই অবস্থা। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রকৃত নীতিই ধর্ম্ম। সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রেম, ভক্তি, চরিত্রের পবিত্রতা, এই সকলই প্রকৃত ধর্ম্ম। পরমেশ্বরকে ভক্তি কর, মানুষকে ভালবাস, ইহাই আসল ধর্ম্ম। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং মনুষ্যের প্রতি ভালবাসা ও তাহার হিতসাধন, ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই মত জগতে প্রচার করিতেছেন। এই মত জগতে প্রচারিত হইতেছে ও হইবে। এমন দিন আসিবে, যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল লোককে বুঝাইয়া দিবেন যে, সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রেম, পবিত্রতা, এই সকলই ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন যাহা কেবল বাহ্যানুষ্ঠান মাত্র, তাহা ধর্ম্ম নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই একটী অতি মহৎ কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা এ কার্য্যটী অতি প্রধান কার্য্য। লোকে বুঝে না যে, প্রকৃত ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কি ও কি না, অতি অল্প লোকেই বুঝে। যাহা কেবল বৃথা বাহ্যানুষ্ঠান, তাহা লইয়াই সময় নষ্ট করে। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা বুঝে না, কেবল কতকগুলি মিথ্যা আড়ম্বরকে ধর্ম্ম মনে করে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জনসমাজের মধ্যে এই জ্ঞান প্রচার করিতেছেন ও করিবেন।

অষ্টম, ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটী কার্য্য এই যে, ইহা জগতের সকল জাতিকে এক জাতি করিবে। এমন এক সময় আসিবে, যখন সকল বিভিন্ন জাতি মিলিয়া এক মহা জাতি হইবে, এবং সকল ভাষা মিলিয়া এক ভাষা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই ইহার মূল কারণ। যখন সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে, তখন সকলে এক হইবে। ধর্ম্মে এক হইলে, ক্রমে ক্রমে, ভাষাও এক হইবে, এবং ক্রমে

ক্রমে আচার, ব্যবহারও অনেক পরিমাণে এক হইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই সুমহৎ ঘটনা অত্যন্ত দূর ভবিষ্যতে। কত দূরে, তাহা কেহ মনেও ভাবিতে পারেন না। কিন্তু সে দিন যে আসিবে, তাহ সম্পূর্ণ নিশ্চয়। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই একটী মহা কার্য্য। লোক নিশ্চয়ই মনে করিতে পারে, ইহা একটী সুখ-স্বপ্ন। কিন্তু এ স্বপ্ন যে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য, জগতের একতা-বন্ধন। অর্থাৎ পরস্পর সকল জাতির মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার এক, সুতরাং বিবাহাদি ক্রিয়াও পরস্পর চলিবে, ইহা নিশ্চিত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কত বড় উচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা কে বুঝিবে? এক দিন আসিবে, যে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে। যে ধর্ম্মের এমন উচ্চ উদ্দেশ্য সে ধর্ম্মের প্রচারে আমাদের প্রাণ-পণে কি যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে? প্রথমে, এ দেশের অবস্থা দেখ। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন এ দেশের উন্নতির কোন উপায় নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, এ দেশের পরিত্রাতা। যে ধর্ম্মের প্রতি দেশের লোকের এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ সেই ধর্ম্মের দ্বারাই এদেশের পরিত্রাণ। কেবল এ দেশের কেন, জগতের পরিত্রাণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্রাহ্ম নিজেই বুঝে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য জগৎ ক্রমে ক্রমে বুঝিবে। এক দিন আসিবে, যে দিন প্রকৃত রূপে বুঝিবে। পৃথিবী ক্রমে উন্নতি লাভ করিবে। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে পৃথিবী যত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই বুঝিতে পারিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য কেমন? যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন লোকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর পবিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কি রূপ গুরুতর, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কি রূপ সুমহৎ কার্য্য।

আর কি বলিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সহিত জগতের উন্নতির কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে কিছু বলিলাম, সামান্যই বলিলাম। যদি লোকে ইহাই প্রকৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহা হইলেই আমি আনন্দিত হইব। পর-মেশ্বরকে ধন্যবাদ। বলা বাহুল্য যে, তিনি এরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই দেশের লোকের জন্য লিখিতে পারিতেছি। তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ, আর সেই সঙ্গে মিডিয়মকেও ধন্যবাদ। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রুগ্ন শরীরে যে এতদূর পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা যথার্থই অত্যন্ত প্রশংসার কথা। তিনি আমাদের যথার্থই ধন্যবাদের যোগ্য। এই স্থলে প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

এদেশের পুরাতন ভৃত্য জনৈক পরলোকবাসী আত্মা—মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অনুবর্ত্তন।

বিশ্ব-মানব-ইতিহাস-সমুদ্র দুরবগাহ,—কত ঘটনা-তরঙ্গ তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে,—কেহ তাহা গণনা করিতে পারে নাই। স্রষ্টার ন্যায়, বুঝিবা, তাহাও অনাদি, শাশ্বত, সনাতন। বৎসর, যুগ, শতাব্দী তাহার উপর দিয়া কত চলিয়াছে, সঠিক কেহ বলিতে পারে

না,—কবে প্রথম মানবের অভ্যুদয়,কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। অনুভূতি, কল্পনা ও সিদ্ধান্ত বলে এক এক জন এক একটা তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কল্পনা-কুজ্ঝটিকায় চির আবৃত। বিশ্ব-মানব-ইতিহাস-সমুদ্র চির-দুরবগাহ।

শ্রেয় এবং প্রেয়, মানবের নিয়ামক। শ্রেয় এবং প্রেয়ের আধিপত্যে মানব কখনও সু এবং কখনও কু অনুসরণ করিতেছে। শ্রেয় দৈববাণী, বিশ্বদূত, বিবেকবাণী, আদেশ, প্রেয় আসক্তি, প্রবৃত্তি, প্রণিধি, প্রমা। শ্রেয় পথে যাঁহারা চলেন, স্বর্গ তাঁহাদের পরিণতি, প্রেয় পথে যাঁহারা চলেন, সাংসারিকতা তাঁহাদের পরিণাম। শ্রেয় আপনাকে ভোলায়; প্রেয় আপনাকে জাগায়। এক চিন্ময়, আর এক মৃণ্ময়। এক চৈতন্যে পৌছায়, অন্য জড়ে মিলায়।

মৃণ্ময় চিন্ময়ের অভিব্যক্তি, জড় চৈতন্যের বহির্প্রকাশ। এ হিসাবে শ্রেয় ও প্রেয়, দুই-ই বিশ্বমানবে বিশ্বদূত। কিন্তু এ দুয়ে চিরকাল সংগ্রাম চলিতেছে। শ্রেয় যেখানে পরাজিত, সেখানে সাংসারিকতা জাগিয়া উঠে, প্রেয় যেখানে পরাজিত, সেখানে ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয়। জীব মহাসংগ্রামে প্রতিনিয়ত সংক্রামিত। শ্রেয়-প্রেয়-সংগ্রামে মানবের অন্তর বাহির সব সংক্রামিত।

এই মহাসংগ্রামে সদা মানব অস্থির। মানবের মনুষ্যত্ব কোথায়? মানবের দ্বিজত্ব কোথায়? মানবের চরিত্র বা প্রকৃত স্বভাব কোথায়? সব যেন মহাসংগ্রামে পরাজিত পর্য্যুদস্ত এবং পরিম্লান। মানব প্রতিনিয়ত প্রেয়ের সংগ্রামে পরাজিত। মানব মরিতেছে, ডুবিতেছে, পচিতেছে, গলিতেছে। কিন্তু মানবের দুর্দ্দশারাশির মধ্যেও, কখনও কখনও এই পৃথিবীতে কোন বীর নিজ-প্রতাপে আসুর-সংগ্রামকে জয় করিয়া মাথা তুলিয়া সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতেছেন। তাহাতেই আজও ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় নাই। মানুষ তাঁহাদের অমানুষী মহত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে দেবদূত বা অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন।

দুষ্কৃতি এবং দুর্নীতিতে যখন জগৎ সমাচ্ছন্ন হয়, পাপভারে যখন ধরা পূর্ণ, তখন তিনি অবতরণ করেন, গীতা বলেন। এ ব্যাখ্যা যুক্তিবাদে না টিকিলেও ভক্তিবাদে উপেক্ষিত নয়। যুক্তিবাদ বলেন,যখন চতুর্দ্দিকের বিশ্বমানবের মনুষ্যত্ব কোন স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন চিন্ময় গুণরাশি জমিয়া জমিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, মৃণ্ময় ভাণ্ডে প্রকটিত হয়। অথবা বিশ্বমানবের সমঞ্জসীভূত উন্নত-চরিত্র দিব্যাকার ধারণ করেন। তখন দেবকীর শ্রীকৃষ্ণ এবং কৌশল্যার শ্রীরাম-চন্দ্র অমিয়া-পরিপূরিত দেবধামের মর্ত্ত্য জগতে বিঘোষিত করে এবং মাভৈঃ মাভৈঃ রবে পাপ-কংস ও পূতনা এবং তাড়কা ও রাবণ বধ করিয়া পাপ-ভারাক্রান্ত ধরাকে রক্ষা করেন। কবিত্ব, রূপক, অলঙ্কার, এবং কল্পনা বাদ দিলে দেখা যায়, হিন্দুস্থান, পালেস-টাইন ও আরব যখন মহা অত্যাচারে ম্রিয়মাণ, তখন বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ আবির্ভূত হইয়া এ তিন দেশকে রক্ষা করিলেন। যুক্তিবাদ এবং ভক্তিবাদ তিনে একাকার হইয়া এই অলৌকিক চিত্রে জগৎকে শোভান্বিত করিল। এ সকলের ইতিহাসও যদি কল্পনা-কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া থাকে, তবে আরো অগ্রসর হইলে আমরা কি দেখি? যাহা দেখি, ক্রমে ক্রমে অনুবর্ত্তন করিতেছি।

অশোকের অনুশাসন ভারতের কত কত

পাহাড় পর্ব্বতে অঙ্কিত রহিয়াছে, সংখ্যা হয় না। রাজগৃহে যাও,খণ্ডগিরিতে যাও,ধউলিতে যাও, নালন্দায় যাও, বৌদ্ধ-ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইবে। পাষাণ দ্বারা হৃদয়কে আবৃত না করিলে, সে সব দেখিয়া চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যাইবে, নয়নে জলধারা বহিবে। কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, প্যালেসটাইনের অণু পরমাণু আজও খ্রীষ্টের জীবন-ত্যাগ-কাহিনী বিঘোষিত করিতেছে। আর আরব? আর মক্কা এবং মদিনা? সেও দুর্জ্জয় বিশ্বাস ঘোষণা করিয়া আজও কোটী কোটী নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। সে সকল অলৌকিক কাহিনী যে শুনে, সে-ই ধন্য হয়।

বিশ্ব-মানব ইতিহাস ছাঁকিয়া যাও—তিন শক্তি জগতে প্লাবিত দেখিতে পাইবে। তিন শক্তির আবির্ভাবে এসিয়া গৌরবান্বিত—তাহার ললাটে বিজয় কিরীট। তিন শক্তি, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, এবং মহম্মদ। কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্কর, জুডাস এস্কারিয়ট, ইহুদী এবং কোরেশ জাতি কত চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনের মহাশিক্ষা, মহাবিপত্য আজও ধরা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও তিনশক্তি জগতে কার্য্য করিতেছে, অহিংসা অকৈতব প্রেম,এবং অনন্ত বিশ্বাস। এই তিন, পাত্র ভেদে বিকৃত হইয়া, আজও পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে, এক অন্যকে বিনাশের চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে একের স্থানে অন্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। কালে কে থাকিবে, বৌদ্ধ, না খ্রীষ্টান না মুসলমান? কালের দুর্ভেদ্য অন্তরালে কি আছে, জানি না। কিন্তু মহাসংগ্রাম যেমন অন্তরে, তেমনি বাহিরে চলিতেছে। কে প্রকৃত বৌদ্ধ, কে প্রকৃত খ্রীষ্টান, কে প্রকৃত মুসলমান? ভিতরে মহাযুদ্ধ রিপুর সহিত, এবং বাহিরে মহাসংগ্রাম সংসারের সহিত। তিন কখনও এক হইল না—তিনে চিরকালই মহাসংগ্রাম চলিতেছে। কে বাঁচিবে, এবং কে টিকিবে,তুমিও জান না, আমিও বলিতে পারি না। কিন্তু সংগ্রাম যে চলিতেছে, তুমি আমি সকলেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

সমুদ্রের জল নির্ম্মল, বর্ণহীন, আকাশের নীলবর্ণে তাহা নীলিম। যেমন পাত্রে ধর, পাত্রের রূপ সে প্রাপ্ত হইবে। অহিংসা, প্রেম, বিশ্বাস—চির নির্ম্মল,চির শান্তিপ্রদ, চির পবিত্র। কিন্তু তাহা সমল-জীব-অন্তরে ধর—তাহা সমল, অপবিত্র,—শ্বেতাঙ্ক, পীতাতঙ্ক এবং লোহিতাতঙ্কময়। ঐ সকল আতঙ্ক আর কিছুই নয়,—শ্রেয় এবং প্রেয়ের সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত নরনারীর হিংসা, অপ্রেম, এবং অবিশ্বাসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। লিখিতে প্রাণ অস্থির—কিসের আহ্বানে পৃথিবীতে আসিলাম, এবং আসিয়া কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিলাম! চতুর্দ্দিক হইতে হিংসা, অপ্রেম, এবং লুণ্ঠনের আসক্তি জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে॥ ভীষণ দৃশ্য! উহার মধ্যে কে সত্ত্ব, কেবা রজঃ, কেবা তম,বলিতে চাই না। বলিতে চাই, চতুর্দ্দিকে,সত্ত্ব, তম এবং রজঃ শক্তির মহাসংগ্রাম। শ্রেয় টানে সত্ত্বের দিকে,প্রেয় টানে রজঃশক্তির দিকে, মধ্যে বসিয়া তম বিকট হাস্য হাসিতেছে। অথবা শ্রেয় প্রেয় উভয়ই তমশক্তির ঘোর চাপে পড়িয়া মারা যাইতেছে। বিমল ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ প্রেম, সনাতন জ্ঞান দিন দিনই জগতে দুর্লভ হইতেছে। পেচকের নৃত্যে, বালকের হাস্যে, অহঙ্কারীর আস্ফালনে আজ সোণার সংসার পরিপূর্ণ। কি ভীষণ দৃশ্য॥ ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

ব্যষ্টিতে যাহা, সমষ্টিতেও তাহাই। মানব দেহে যাহা, মানব সমাজেও তাহাই অভিব্যক্ত। দেহে দেহে সত্ত্ব, রজঃ, তমের বিবাদ,

সমাজে সমাজে উহাদেরই প্রতিবিম্ব। জাতিতে জাতিতে তাহারই প্রতিকৃতি। আপন ভুলিয়া কে কবে পরের ভাবনা ভাবিতে পারিয়াছে? খাই, পরি, শুই, যাই, সবই আমি। মরি বাঁচি, সবই আমি। আমিত্বের প্রসারণে জগৎ পূর্ণ। আমিত্বের প্রসারণ সমাজে, সমাজের প্রসারণ জাতিতে, জাতির প্রসারণ বিশ্বজাতিতে—বিশ্ব মানবে। সংগ্রাম চতুর্দ্দিকে।

মহাত্মা বুদ্ধদেব, অহং-নির্ব্বাণের মহৌষধ—আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়া অহিংসা রূপ পরম ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই মহাশিক্ষা আজ কালের কুক্ষিগত হইল কেন? আজ ভারত হইতে তাঁহার সাম্যবাদ বিলুপ্ত, চীন, জাপানে যে শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহা রাজসিক গুণের অভিব্যক্তি,—আভিজাত্য মাত্র। সেখানে সত্বের যেন চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইয়াছে। খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ কিসের জন্য? জীবের উদ্ধারের জন্য নয় কি? কিন্তু খ্রীষ্ট-শিষ্যগণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে কেবল রক্ত পিপাসা, কেবল রাজসিক প্রভাব, কেবল অন্যের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা। আর মহাত্মা মহম্মদের জলন্ত বিশ্বাস? নিষ্কাসিত-অসিধারী শত্রুর সম্মুখীন হইয়াও যিনি বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই, বন্ধু আছেন," তাঁহার সেই জলন্ত বিশ্বাস আজ কোথায়? হায়, সাত্বিকতা, মহা সংগ্রামে চিরজয়ী তোমারই শেষে পরাজয় হইবে, চতুর্দ্দিকে জাগিয়া উঠিবে কেবল জড়বাদ, আভিজাত্য এবং ইম্পিরিয়ালিজম?

ইম্পিরিয়ালিজম, সাম্যবাদের চির-বিরোধী। যখন ইম্পিরিয়ালিজমে ফ্রান্স মাতোয়ারা, তখন ভল্টেয়ার ও রুশোর তীব্র লেখনী সাম্য মন্ত্রের ভীষণ অগ্নি উদ্‌গীরণ করিয়া নরনারীকে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহার ফলে কি হইয়াছে, সকলেই জানেন। "অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম"ভাব যখন চীনে পরিম্লান হইতেছিল, তখন কনফিউসস্ অভ্যুদিত হইয়া ধর্ম্ম ও সাম্য নীতি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। বৈষম্য যখন রোমের আভিজাত্যদিগের গৌরব ঘোষণায় ব্যাপৃত, তখন রিয়েঞ্জি অভ্যুদিত হইয়া পেট্রিসিয়ানদের অত্যাচারের হস্ত হইতে প্লিবিয়নদিগকে রক্ষা করিয়া সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আভিজাত্যের চরম পরিণতি পোপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে লুথার আবির্ভূত হইয়া সাম্যের ভেরী বাজাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রধান শাক্ত ধর্ম্মের অত্যাচারে যখন বঙ্গ অরাজকতায় পূর্ণ, তখন শ্রীচৈতন্য অভ্যুদিত হইয়া প্রেমে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বঙ্গে সাম্যের স্রোত ফিরাইয়াছিলেন। আমেরিকার আভিজাত্যের মাথায় পা দিয়া ওয়াসিংটন, এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে লিখিয়া থিয়োডোর পার্কার জগতে অমর হইয়াছেন। আর সেদিন, মিসর-সমরের দিনে, ব্রাইট ঐ অধর্ম্ম যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া অমর হইয়াছেন। আভিজাত্যপ্রধান রুসিয়ায় টলষ্টয় সাম্য প্রচার করিয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। আভিজাত্য—অহং-জ্ঞানের পরিণতি। ইম্পিরিয়ালিজম আভিজাত্যের চরম ফল। জগতে ইদানীং আবার আভিজাত্য বড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমিত্ব এবং স্বামীত্বের বিজয় নিশান চতুর্দ্দিকে উড়িতেছে। আজ কোথায় রিয়েঞ্জি, ভল্টেয়ার, রুশো, থিয়োডের পার্কার, শ্রীচৈতন্য, লুথার, এবং টলষ্টয়?

বিশ্ব-মানব চায় বিশ্ব-প্রেম। বিশ্বজাতীয়তা চায়, অহেতুকী প্রেমের মিলন। প্রেম ভিন্ন বিশ্বব্যাপী মিলন অসম্ভব। আমি আমার নই, জগতের;—আমার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, চরিত্র সকলই বিশ্ব-মানবের, এ কথা

বলিতে পারেন কে? পূর্ব্বের কথা ভাল করিয়া বলিতে সঙ্কুচিত হই; এ যুগে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আভিজাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, শুধু ঘোষণা নয়, পরের জন্য জীবন পাত করিয়া অমর হইয়াছেন, ম্যাট্‌সিনি, বুথ টলষ্টয় এবং বিবেকানন্দ। শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় নাই, তাঁহারা সে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সে শিক্ষা এই, আভিজাত্য-পূজায় মানবের মঙ্গল নাই,—মানব-জীবন স্বার্থ-সাধনের জন্য নয়, তাহা কেবল পরার্থ সাধনের জন্য। বুথ ও টলষ্টয় বিবাহিত, কিন্তু ম্যাট্‌সিনি এবং বিবেকানন্দ চিরকুমার, তাঁহারা উভয়ে বিশ্ব-মানবকে বিবাহ করিয়া এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন মান, সবই দেশের, সবই বিশ্ব-মানবসমাজের। পরার্থপরতার এমন শিক্ষা জগতে আর কে কবে দিতে পারিয়াছে?

ইংলণ্ডে অনেক চরিত্রবান প্রাতঃস্মরণীয় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বুথের ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক লোক আর জন্মগ্রহণ করে নাই। ইতালী অনেক মহাপুরুষের অভ্যুদয়-ক্ষেত্র, কিন্তু ম্যাট্‌সিনির ন্যায় উদার বিশ্ব-প্রেমিক মানব সেখানে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। আর এই বঙ্গে? পূর্ব্বে পূর্ব্বে এবং এই উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের ন্যায় বিশ্ব-প্রেমিক, দরিদ্র-বন্ধু আর একালে বুঝিবা জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদিগের কি স্বার্থত্যাগ, কি জ্বলন্ত প্রেম, কি চরিত্রের মাধুর্য্য।

ধনীর পদ-লেহন করে না কে? ধনের পূজা কে পরিহার করিতে পারিয়াছে? ধন,—উহা যে একালের যথাসর্ব্বস্ব,—যাহা কিছু বল, সবই উহা দ্বারা ক্রয় করা যায়। এমন ধার্ম্মিক এদেশে মুষ্টিমেয়, ধনোপার্জ্জনের জন্য অস' উপায় যাঁহারা অবলম্বন করেন না! আচার্য্য বল, প্রচারক বল, নেতা বল, সবাই ধনের কাঙ্গাল—সকলেই চরিত্রকে তৃণের ন্যায় ধনের জন্য বলি দেন। আর কামিনীর আকর্ষণে সকল সাধন-ভজন মুহূর্ত্তের মধ্যে উড়িয়া যায়! এজন্য পরমহংস রামকৃষ্ণ সর্ব্ব প্রযত্নে কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণে মানুষ সব ভুলিয়া যায়। এক বিবেকানন্দকে বাদ দিলে, কামিনী-কাঞ্চনে ভুলেন নাই এবং স্বার্থ সাধন করেন নাই, এদেশে একালে সেরূপ দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। ম্যাট্‌সিনি যাহা ইতালীতে, টলষ্টয় যাহা রুসিয়ায়, বুথ যাহা ইংলণ্ডে, বিবেকানন্দ তাহা ভারতে। রিপুজয়ী, সংসার জয়ী—প্রেম-জয়ী পরমার্থ পুরুষ, পরম নিষ্কাম সন্ন্যাসী। ম্যাট্‌সিনী যাহা ইতালীতে করিয়াছেন, বুথ যাহা ইংলণ্ডে করিয়াছেন, আমাদের বিবেকানন্দ তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে যৌবনেই লীলা শেষ করিলেন। এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই যে, এহেন সোণার চাঁদকে ভারত অল্পেই হারাইল"। কিন্তু তবুও একথা বলি, তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, ভগ্নী নিবেদিতা যে শিক্ষার চরম ফল, তাহা আজও চতুর্দ্দিকে কার্য্য করিতেছে। বাঁচিয়া থাকিলে না জানি তিনি কি অসাধ্যই সাধন করিতেন। বুথের ন্যায় তাঁহার কোন বংশধর নাই যে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে, কিন্তু আমরা আশা করি, ভারতের নগরে নগরে অসংখ্য লোক তাঁহার নিঃস্বার্থ জীবন-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ছুটিয়া আসিবে। তাঁহার পূত-চরিত্র-আদর্শ কি বৃথাই যাইবে?

এই কয়েক জন মহাপুরুষের মহাশিক্ষার প্রভাব কালে সীমা হইতে অসীমে, ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে এবং বিশ্ব মানবকে অনুপ্রাণিত করিবে।

কি গুণে উঁহারা জগজ্জয়ী বীর? তাঁহাদের জীবনে প্রেয় পরাস্ত, শ্রেয় জয়-যুক্ত। দেখিয়া শুনিয়া, মজিয়া গলিয়া তাঁহারা আপনাপন রিপু ও স্বার্থ জয়ে সমর্থ হইয়া, জগজ্জয়ী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংযম তাঁহাদের জীবনের ভূষণ, নিষ্ঠা তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য্য, প্রেম তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্র। কামনা, বাসনা, আসক্তি, প্রবৃত্তি সকলকে তাঁহারা নির্ব্বাণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। অনুশীলন, অনুসরণ, অনুকীর্ত্তন, অনুবর্ত্তন, সব তাঁহাদের আত্ম-বর্জ্জনে। সেই শাস্ত্র তাঁহাদের কণ্ঠস্থ, সে শাস্ত্র আত্মত্যাগ-মন্ত্র কীর্ত্তন করে, সেই আদর্শ তাঁহাদের লক্ষ্য, যে আদর্শ আত্মত্যাগ শিক্ষা দেয়, সেই মহত্ত্ব তাঁহারা ঘোষণা করিতেন, সে মহত্ত্ব নিষ্কাম হইতে শিক্ষা দেয়। সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবি, তাঁহারা কি ছিলেন? অন্তঃসারশূন্য, বাহ্যচটক ও গিল্টিময় জগতের কাহার সহিত তাঁহাদের তুলনা করিব? যাঁহাদের বংশধরগণ উত্তরাধিকারী সূত্রে তাঁহাদের পিতা, পিতামহের মন্ত্রে বা চরিত্রে অনুপ্রাণিত নহেন, তাঁহাদের সহিত এ হেন মহাত্মাদের তুলনা করিলে অবিচার করা হয়। এক এক বিভাগের এক এক মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের যোগ্য উপমা কুত্রাপি মিলে নাই। তাঁহারা অতুলনীয়, অমানুষী শক্তিতে জগজ্জয়ী, তাঁহারা অপার্থিব জিনিসের অনুবর্ত্তন। স্বার্থ সেখানে উৎসৃষ্ট, পরার্থ সেখানে প্রকট,—অথবা সেখানে স্বার্থ নির্ব্বাণ হইয়া শুধু পরার্থ জাগিয়াছে, অথবা 'স্ব' (Self) সেখানে উড়িয়া গিয়াছে, অথবা 'পর'ময় জগতে মিশিয়া গিয়াছে,—"পর" বলিতে আর কিছুই নাই, সব 'স্ব'-ময় হইয়াছে। বিশ্বমানবের মানবত্ব সেখানে ঘনীভূত। বুথের বংশে এরূপ অহেতুকী শ্রেয়-পূত পরার্থপরতা প্রতিষ্ঠিত, পুত্র-কন্যাহীন বিবেকানন্দের শিষ্য-মণ্ডলী আজ "পরার্থপরতার" বিজয় নিশান হাতে লইয়া সংযম-পূত সাধন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। আর ম্যাটসিনি? যে ইতালী আজ স্বাধীন, যে ইতালী আজ আবার নববলে বলীয়ান, যে ইতালী আবার বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত কর্ম্মপটু মহাশক্তি রূপে জগতের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, ম্যাট্‌সিনির সংযম, চরিত্র, আত্মত্যাগ-মন্ত্র তাহার সর্ব্বাংশে অনুস্যূত। তাঁহাদের জীবনের অসংখ্য ঘটনার দ্বারা এ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থান নাই। স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমে মহাযোগে যুক্ত না হইলে সেই চরিত্রত্রয়ে অণুপ্রবেশ অসম্ভব। অতএব যদি দেখিতে চাও, বুঝিতে চাও, ডুবিতে চাও, ত্রিবিধ চরিত্র-মাহাত্ম্যে অনুপ্রবেশ করিয়া অধ্যয়নে তৎপর হও। শুধু অধ্যয়ন নয়, অনুসরণ কর। শুধু অনুসরণ নয়, অনুপ্রাণিত হও। নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—ধন্য হইয়া যাইবে।

বহুদিন হইল এই তিনজনই চলিয়া গিয়াছেন—শুধু তাঁহাদের চরিত্র আভিজাত্য ও ইম্পিরিয়ালিজমের সহিত যুদ্ধ করিতে রহিয়াছে। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, এখন ইম্পিরিয়ালিজমের সংগ্রামের ফল কি হইবে, বিধাতাই জানেন। তাঁহারা গিয়াছেন, রুসের টলষ্টয়ও গিয়াছেন। এদিকে আভিজাত্য সকলগ্রাস করিতে চাহিতেছে। পরিণাম কি, কে জানে? আমরা কেবল ঘটনাপুঞ্জের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছি। সকল অবস্থায় বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৭। Guide-book—Varendra Research Society.—

বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের রাজসাহী গমন উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে বারেন্দ্র রিছার্চ-সোসাইটীর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য কেবল প্রাচীন যুদ্ধ ও রাজরাজড়ার গল্প শুনিয়া চিত্তরঞ্জন করা বা স্মৃতির দুর্ব্বল স্কন্ধে শুষ্ক সন তারিখের গুরুভার অর্পণ করা নহে। রাজনীতি চর্চ্চাও ইতিহাস-পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। দেশের লুপ্ত গৌরবের চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংরক্ষণ করা ইতিহাস পাঠকের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। বরেন্দ্রভূমি অতীতে বঙ্গের গৌরব-কেন্দ্র ছিল। তথায় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। বিদ্যানুরাগী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র বি-এল মহাশয়দিগের যত্নে বারেন্দ্র ঐতিহাসিক গবেষণা-সমিতি যে কর্ম্মজীবনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অনুকরণীয়।

৩৮। মিবার-গৌরব-কথা, শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত, মূল্য ।৵০।

টড সাহেবের রাজস্থান হইতে পদ্মিনী প্রভৃতি দ্বাদশটী উপাখ্যান সংক্ষেপে সরল ও হৃদয়-গ্রাহিণী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রত্যেক বালক বালিকার পাঠ করা উচিত। ইহা শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক স্কুল-পাঠ্যরূপে বা পুরস্কারের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইলে সুখী হইব।

৩৯। Lord Ripon in India, by Nrisinha Chandra Banerjee, price as 6- এই পুস্তকে ভারতবর্ষের জনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা লর্ড রিপনের শাসন কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংরাজী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। লেখক ন্যাসন্যাল মুভমেণ্ট ও "স্বদেশী" সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—

"It (Swadeshi) includes in its category primarily the principle of self-conciousness, self-help and self-development" লেখকের ইংরাজী লিখিবার ক্ষমতা আছে। ভাব সুশৃঙ্খল ও ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত।

৪০। কায়স্থ তত্ত্ব-নির্ব্বাচন, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ॥০।

এই পুস্তকে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি ও মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মিত্র মহাশয় শাস্ত্রদর্শী, তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন, কায়স্থগণ প্রকাণ্ড ক্ষত্রিয় সমাজের একটী শাখা মাত্র। আজকাল ব্রাহ্মণ,কায়স্থ, বৈদ্যে বিষম জাতি সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কলহের আবর্ত্তে আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। স্বার্থের কলহ, হিংসার কলহ, মতের কলহ, প্রবৃত্তির কলহ, ইহার সহিত জাতিভেদের কলহের যোগ হইলে দাবানলের আর বাকী থাকিবে কি?

৪১। ত্রিবেণী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১৲।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যের মহারথী, মাতৃভাষার সু-সন্তান। তাঁহার স্বদেশী গানে কোটী প্রাণ মাতোয়ারা। মিত্রাক্ষর, মাত্রিক ও দশপদী, এই ত্রিবিধ কবিতার সম্মিলনে পুস্তকের নাম ত্রিবেণী হইয়াছে। গঙ্গা-

যমুনা-সরস্বতীর ন্যায় এই কবিতাগুচ্ছ পাঠকের প্রাণ পবিত্র ও চিত্ত বিনোদন করুক। কবি বলিয়াছেন—

"সম্ভবতঃ আমার খণ্ড কবিতা রচনার এই-খানিই পরিসমাপ্তি!" আশা করি, কবির তুলিকা এখন মহাকাব্য ও মহানাটক চিত্রিত করিতে নিযুক্ত।

"মানুষের সুখদুঃখ, মানুষের পুণ্য পাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।"

৪২। পরলোক-রহস্য। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। মূল্য ।৵০।

এইক্ষুদ্র পুস্তকে বিশুদ্ধ ভাষায় যুক্তিপূর্ণ কথায় পণ্ডিত-কুল-গৌরব বেদান্তবাগীশ মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রমতে পরলোকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। পরলোক-রহস্য আলোচনা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তর-তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। শেষ পরিচ্ছেদে তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ইহা পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকারের যুক্তির সারাংশ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বর্ত্তমান,—

সন্দেহেঽপি পরে লোকে বরমাস্তিক্যমাশ্রিতাঃ
নাস্তি চেন্নহি নো হানিরস্তিচেন্নাস্তিকো হতঃ॥

৪৩। হিমালয়-ভ্রমণ, পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ প্রণীত, কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৲।

এ পুস্তকে হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কেদার-নাথ, গঙ্গোত্তরি, উত্তরকাশী, যমুনোত্তরি প্রভৃতি পার্ব্বত্য তীর্থস্থানের ও তাহাদের পথের বিশদ বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহা ঐ সকল তীর্থের যাত্রিগণের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। পরিব্রাজক মহাশয় পুস্তকান্তর হইতে বিবরণ সঙ্কলন করেন নাই, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বহুদর্শিতার ফল এইগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষায় তত লালিত্য নাই।

৪৪। মিরণ। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতা-গ্রন্থের অভাব নাই। মাসে মাসে রাশি রাশি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। কাজেই সহসা কোনও কবিতা গ্রন্থ হাতে পড়িলেই ততটা মনোযোগ আকর্ষিত হয় না, মনে হয়, বুঝি ইহাও সেই চির প্রচলিত মামুলি প্রেমের গাথায় পূর্ণ, সেই একই মরমের কথায় ভরা। গ্রন্থকারের নিকট হইতে মিরণ বহিখানা উপহার পাইয়াও তাহাই মনে হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, ইহাও বুঝি সেই একই শ্রেণীর গ্রন্থ। তাই ভয়ে ভয়ে পাতা উল্টাইয়াছিলাম। কিন্তু দু চারিটী কবিতা পড়িয়াই সে ভ্রান্তি ঘুচিয়া গেল। লেখিকা তদীয়া লোকান্তরিতা স্নেহময়ী কন্যার শোক-স্মৃতিকে স্বতঃ-প্রবাহিত জ্বালাময়ী কবিতায় জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয় যখন শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, যখন মর্ম্ম-বেদনায় প্রাণ ব্যাকুল আবেগে শান্তির অন্বেষণে আত্মহারা হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন তাহার ভিতর হইতে যে আবেগময়ী ভাষা স্বতঃ-নিঃসৃত হয়, তাহা বড়ই মধুর এবং প্রাণস্পর্শী হইয়া থাকে। এজন্যই একজন ইংরেজ কবি গাহিয়াছেন, সেগানই মধুর, যাহা গভীর বেদনার বার্ত্তা বহন করে। 'মিরণে'র কবিতা প্রাণের কবিতা। কন্যা-বিয়োগ-বিধুরা জননী কন্যা-শোকে আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া প্রাণের বেদনাগুলিকে ভাষায় ধরিয়া রাখিয়া-ছেন,—তাই এই গ্রন্থের কবিতাগুলি গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় কি যেন এক করুণ গীতি

গাহিতে গাহিতে পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে একটা নিরাশার ও বেদনার বাণী জাগাইয়া দিয়া বহিয়া যায়। মিরণের অনেক কবিতা পাঠ করিয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, কোন কোন কবিতা পাঠ করিবার সময় অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। শোকাতুরা জননী "শ্মশানে" শীর্ষক কবিতায় কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"গৃহ ছেড়ে কেন এলি বেড়াতে শ্মশানে।
নীরবে শুয়েছ হেথা,
পড়ে আছ স্বর্ণলতা,
সুকুমার কোমলাঙ্গ কেন মা এখানে?
• • •
কথা কও আঁখি মেলি স্নেহলতা মোর।
জন্মান্তের তীর্থভূমি,
হেথায় কেন মা তুমি
কচি মেয়ে? এবয়সে তীর্থ সাজে তোর!
• • •
শ্মশান-বাসিনী হবি মহামায়া সনে?
তাই যদি প্রাণ চায়,
ভাল তাই হবে আয়,
সে পথ দেখাযে তোরে দিব নিরজনে।
এই দেখ মাতৃ হৃদি পবিত্র শ্মশান
ঐ নাচে মহামায়া,
চিতাভস্মে ঢাকি কায়া
এর চেয়ে পূততর কোথা পাবি স্থান।"

কি সুন্দর। 'চাতকিনী' কবিতাটী শোক-দগ্ধ জননীর সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে ভরা। তৃষাতুরা চাতকিনীর উদ্দেশে কবি গাহিয়াছেন,

"আর কিছু নাই কথা,
"দে জল" এই কি ব্যথা?
বেজেছে কি বুকে তোর, ঝরিছে নয়ন।
চাতকিনি, এস কাছে দিবগো তোমায়
এ আঁখিতে যত জল
নিত্য করে ঢল ঢল;
তাতে সখি তৃষ্ণা তোর মিটিবেনা হায়!
আমিও তোমার সাথে বেড়াব উড়িয়া!
যত অশ্রু যেথা আছে
ভিক্ষা মেগে লব যেচে,
দিব জল তৃষ্ণা ভরে আকণ্ঠ পূরিয়া!
বড় সকরুণ তোর মর্ম্মভেদী সুর।
ও সুর স্বপনে ছাওয়া,
ও সুর নন্দনে গাওয়া
ও সুর আবেশময়ী, কাছে থেকে দূর।'

শোক যখন ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা ও ব্যক্তিগত বেদনায় আবদ্ধ না রহিয়া বিশ্বের শোকে, নিখিলের অভাব-ব্যথায় আপনার চিত্ত-ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া তোলে, তখন আত্ম-বেদনার মধ্যে হইতে বিশ্বের বেদনা উপলব্ধি হয়; তখন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ প্রেম হইতে বিশ্বজনীন প্রেমের অগাধ অনন্ত পাথারে তাহা বিলীন হইয়া বিশ্বের হিতে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে চাহে। সে শোক, সে অশ্রুই অতুলনীয়। নারী-হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল, পরের দুঃখে আপনা হইতেই তাহা বিচলিত হইয়া পড়ে। মিরণের অভাব-জনিত ক্লেশে তাই আজ ব্যথিতা জননী সমগ্র বিশ্বের বেদনা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া দ্বারে দ্বারে অশ্রু ভিক্ষা করিতে চলিয়াছেন, তাই ক্ষুদ্র চাতকিনীর পিপাসা নিবারণার্থে স্বকীয় অশ্রুজল প্রদান করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, বুঝিয়াছেন,—

"অশ্রুই জীবন পথে প্রকৃত সম্বল।
অশ্রু নাই যার তার জীবন বিফল।
অশ্রু মুক্তা, অশ্রু রত্ন, জগতের সার।
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী অবনী মাঝার।
অশ্রু ব্যথা, অশ্রু হাসি, বিচিত্র সুষমা।
প্রিয় হিতে প্রিয়তর—চির প্রিয়তমা।
অশ্রু জ্ঞান, অশ্রু ধ্যান, অশ্রুই ধারণা।

অশ্রু প্রাণ, অশ্রু মন, ঈশ্বর প্রেরণা।
অশ্রু স্পর্শে হীন ধাতু সোণা হ'য়ে যায়।
এমন পরশমণি কে পাবে কোথায়?
মূক চিন্তা অশ্রু স্পর্শে হয় ভাষাময়
অশ্রুর অভাবে হয় ভাবের প্রলয়।
অশ্রু রূপ, অশ্রু রস, অশ্রু গন্ধ সার।
অনন্ত রহস্যময়ী সঙ্গিনী আত্মার।"

অরণ্যানী মধ্যে যেমন বনফুলের উশৃঙ্খল সৌন্দর্য্য—যেখানে কুটজ সেখানেই হয় ত কদম্ব, যেখানে মল্লিকা সেখানেই হয় ত অজ্ঞাত নির্গন্ধ বন্য-কুসুম, কোন শৃঙ্খলা নাই, তবু সে উশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে মাধুর্য্য ও মহিমা আছে,তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। নিবন্ধ রচয়িত্রীর হৃদয়-অরণ্য-জাত কুসুমগুলিও তেমনি উশৃঙ্খল ভাবে শোভিত, ধনীর বাগানের ন্যায় সুদক্ষ মালীর সযত্ন-প্রভাবে ইহা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে সুশোভিত নহে। এ জন্যই এ কাব্যের এত মধুরতা। পাখীর গানের ন্যায়, আপনার ভাবে আপনারি ছন্দে, আপনার সুরে,তরঙ্গিণীর ন্যায় স্বীয় কলস্বরে,কবিতাগুলি সরস নবীনতায়, সরল কোমলতায়, বন-কুসুমের অম্লান সুরভি-সুষমায় ফুটিয়াছে। কবি কখনও বলিতেছেন,—

"প্রভাতের ফুল হ'য়ে সে যদি আনিত বয়ে
রজনীর মরম বেদনা।
না হয় থাকিত ঢাকা, উষার সমীর মাখা
মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড চেতনা।
না হয় ফুটিত ভোরে, মুদিত সাঁজের ঘোরে,
শূন্য প্রাণে করিত সে খেলা,
না হয় বাঁশীর তানে কোকিলের কুহু গানে
ফুটিত সে প্রদোষের বেলা।
না হয় জ্যোছনা পাতে নিশীথ গভীর রাতে
ফুটিত সে সোহাগের ফুল,
প্রকৃতির স্তব্ধ বুকে ঘুমায়ে থাকিত সুখে
না হয় সে রহিত মুকুল!"

আবার তখনি বিশ্বপিতাকে স্মরণ করিয়া, শোককে হৃদয় হইতে দূর করিবার জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায়, সংসার ত্যাগী সাধুর ন্যায় নিজের আত্মাকে সান্ত্বনা দিতেছেন,—

"কেবা গেল আগে পিছে,
তার লাগি শোক মিছে,
এখানে যে আশা কর্ম্মভোগ,
যে গেল সে গেল চলে
কর্ম্ম অবসান হলে,
হ'ল তার ভোগের বিয়োগ।
* * * *
শিখাও শিখাও তুমি,
চরণ আশ্রিতা আমি,
ত্যাজ নাক প্রভু দয়াময়।
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
ঘুচাও এ শোক তাত
মায়া-শূন্য কর গো নিলয়।

এইরূপ সরস ও হৃদয় গ্রাহী রচনায় গ্রন্থের আগাগোড়া পূর্ণ। লেখিকা যে কেবল শোক-গীতি রচনায়ই সাফল্য ও কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে, প্রাকৃতিক বর্ণনায়ও কবি সিদ্ধহস্ত। তপোবন, লীলাবরণ, সমুদ্র, জাহ্নবী, শশধর প্রভৃতি কবিতাগুলিই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের পরিচায়ক। ছন্দে বৈচিত্র্য না থাকিলেও লালিত্য এবং সহজ সরল গতি আছে, প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই প্রাণ আছে।

লেখিকা যে নূতন ব্রতিনী, তাহা কতক-গুলি কবিতা পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়, সেগুলির মধ্যে ছন্দের, ভাবের ও ভাষার দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু সেগুলি গ্রন্থের গুণের তুলনায় অতি নগণ্য, সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে কোনও মাসিক পত্রিকা-

দিতে গ্রন্থ-রচয়িত্রীর রচিত কোন কবিতা ইত্যাদি পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশেই তিনি যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, যেরূপ আশার সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, যদি তিনি মনোযোগের সহিত কাব্য-সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই কবি-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবেন। আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে এই কবিতা-গ্রন্থ খানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি এবং একথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, যিনিই ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হইবে। উপসংহারে লেখিকাকে সাদরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভিবাদন করিতেছি।

৪৫। পরপারে, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১॥০।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "পরপারে তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক।" কবি ডি, এল রায়ের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। অল্প সময়ের মধ্যে আপামর-সাধারণ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার ন্যায় সমাদর ও খ্যাতি অপর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তাঁহার দুর্গাদাসের এবং তাঁহার "বঙ্গ আমার জননী আমার" ও 'আমার জন্মভূমি' সঙ্গীতের বর্ণে বর্ণে স্বদেশ-প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তাঁহার comic songs শুনিয়া সহস্র সহস্র নরনারী হাসিয়া আকুল। অতএব সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহারথী দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতিভা সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। এরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকের লেখনী-প্রসূত 'পরপারে' এক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। সুখদুঃখ, ঘৃণা ভালবাসা, আশা নিরাশা, ভয় ভক্তি, স্বার্থ পরার্থ, বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রভৃতি বিরুদ্ধ বৃত্তির দ্বন্দ্ব ও ঘাত প্রতিঘাত নাটকের প্রধান উপাদান। এগ্রন্থে নিপুণ হস্তে তাহা যথেষ্ট চিত্রিত হইয়াছে। যাঁহার লেখনী মুখে 'সে কি। মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্বনা। তবে কি পশুকে বিশ্বাস কর্ব্ব?' "গরীব চাইলে যে চখে জল আপনি আসে," প্রভৃতি নির্গত হইতে পারে, তিনি ধন্য, তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক।

হিন্দু সমাজের চিত্র এ নাটকে কতটুকু আছে এবং চরিত্রাঙ্কণে নাটককার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বিশেষ বিচার্য্য। এই শান্তি ও শোকান্তক,বিয়োগ ও মিলনান্তক নাটকের প্রধান পুরুষ-চরিত্র বিশ্বেশ্বর ও মহিমারঞ্জন, প্রধান স্ত্রীচরিত্র সরযূ ও শান্তা। বিশ্বেশ্বর আদর্শ পুরুষ হইতে পারেন না · তিনি মহাপাপী, আত্মহত্যাকারী। মহিমারঞ্জন মাতাল, লম্পট, নারীহন্তা, জননীনিগ্রহকারী। সরযূ মুখরা, স্বামীকে ভালবাসিতে পারে না। শান্তা বেশ্যা হইলেও দেবী। ইহাই কি হিন্দু সমাজের চিত্র? গ্রন্থে সকল চরিত্র মলিন হইয়া পতিতা শান্তার চরিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই কি হিন্দুসমাজের পরিণাম? বিশ্বেশ্বর দাতা, মানুষের কষ্ট দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল আইসে, তাঁহার শত্রুর বাড়ীতে যাইয়া উপযাচক হইয়া তিনি অর্থ দিয়া আসিলেন, তাঁহার স্নেহের সরযূর স্বামীকে রাজভক্ত প্রজার কর্ত্তব্যের অনুরোধে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, পরিশেষে অশীতিবর্ষ বয়সে হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে যাইয়া আত্মহত্যা করিলেন। হিন্দুর বিশ্বেশ্বর পাগল হইলে, মহিমকে আশ্রয় দিয়া গৃহত্যাগী হইতেন, অথবা সরযূকে লইয়া মহিমা নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বেই কাশীবাসী হইতেন, কদাচ আত্মহত্যা করিতেন না। বিশ্বেশ্বরের সরযূর প্রতি অগাধ ভালবাসা ও

ঘোর আসক্তি এবং নরসেবার জন্য সকল সম্পত্তি বিলাইয়া দেওয়া, এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। নরসেবা যাহার জীবনব্রত, সে সরযূর ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ অগ্রাহ্য করিয়াও সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু শোকে আত্মঘাতী হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যাহার প্রাণ জননীর ন্যায় সরযূগত, নাতিনী যাহার ভবত বাজার হরিণ শিশু সে যত্ন করিয়া সরযূর বিষয় রক্ষা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

সরযূর প্রাণ সংহারের নিমিত্ত বিশ্বেশ্বরের আত্মহত্যা যদি নাটককারের নিকট একান্তই আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল ত তাহা দর্শক সমক্ষে না হইয়া নেপথ্যে হইলেই ভাল হইত।

মহিমারঞ্জন পাপিষ্ঠ, আপন প্রাণ বাঁচাইতে যুবতী ধর্ম্মপত্নীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে ইতস্ততঃ করিল না। তাহাকে দ্বিতীয় বিল্বমঙ্গল রূপে সাজাইয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের চরিত্রের দৃঢ়তা মহিমের নাই। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, শান্তা মহিমকে উদ্ধার করিল। তাঁহারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, ইহারা পরপারে কালী করালী মূর্ত্তি হেরিয়া মোহিত হইল। সরযূ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে মহিমের হয় ত এ দুর্গতি হইত না। সরযূর ওজন করা কর্ত্তব্যের প্রেম মহিমের মাতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির দিন হইতে শুকাইয়া গেল। মহিমের শূন্য প্রাণ শান্তার গৃহে ও মদিরা সংসর্গে শান্তি অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহিম বড় দুঃখে আক্ষেপ করিয়া বলিল—"ভালো হ'তে পার্ত্তাম যদি মাঁয়ের প্রতি প্রথমে ভক্তি থাক্‌তো।"

সরযূ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, পিতামহের আদরের পুতুল। পরিবারে স্ত্রীলোক না থাকিলে কন্যার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। সরযূর চরিত্রও অসম্পূর্ণ। পাখী যেমন ডানায় ঘিরিয়া সন্তান রক্ষা করে, এবং মুখে করিয়া তাহার আহার যোগায়, বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরও তেমনি করিয়া নাতিনী সরযূকে 'মানুষ' করিলেন। সুন্দর সুশিক্ষিত মহিমকে খুজিয়া আনিয়া সাধের নাতিনীকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু সরযূর অদৃষ্টে সুখ নাই। বিবাহের পরই সে তাহার দাদা মহাশয়কে বলিল, 'এ বিবাহে আমি সুখী হইতে পারিব না।' এস্থলে কি বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল না? পতিগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সরযূর সহিত বিশ্বেশ্বরের রসিকতা মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াছিল। "এরা সব শুধু ভব-ঘোরে ঘুরে মর্চ্ছে, তাদের মধ্যে মজা লুঠছি যা, সে—তুমি আর আমি।' পরক্ষণেই নাতিনীর প্রতি দাদা মহাশয়ের উক্তি, যেন ভীষণ অভিশাপ—"নে, মিথ্যার রাজত্ব ভাল করে ভোগ ক'রে নে। শীঘ্রই এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।"

এই কি স্নেহ মমতার পরিচয়, এই কি ভালবাসা? এখানে দাদামহাশয় ডাইনীর পার্ট অভিনয় করিলেন। মহিম পূজার ছুটীতে বাড়ী যায় নাই, নব পরিণীতা যুবতীপত্নীর প্রেমমোহে মোহিত হইয়া দাদা-শ্বশুরের বাড়ীতে আছে। এই অপরাধে সরযূ টিট কারী দিয়া স্বামীকে বলিতেছে, 'আর তুমি একটা নগণ্য নারীর পায়ের তলায় প'ড়ে আছো!' হিন্দু স্ত্রীর মুখে পতির প্রতি এরূপ উক্তি কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা, জানি না। বিশ্বেশ্বরের বীর্য্য ও শিক্ষার ফল কি এই? যে সরযূ শান্তাকে গর্জ্জিয়া বলিল, 'কে তুমি! কি সাহসে আমার কাছে

এসে আমার পতিনিন্দা কর্চ্ছ'।' সেই সরযূ পরমুহূর্ত্তেই তাহার পতিকে তপ্তকথা শুনাইতেছে, 'সে কথার বিচার একজন মাতালের মুখে শুন্‌তে চাই না।' মহিম খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ফেরার হইয়াছে, সরযূর একমাত্র পুত্র অনাহারে মরিয়া গিয়াছে, সরযূ দাদা মহাশয়ের সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব লইয়া বাঙ্গালা নাটকের ভাষায় রসিকতা আরম্ভ করিল। এ চিত্র কেবল হিন্দু সমাজে নহে, সমস্ত নব-সমাজেই অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক ও অনুকূল অবস্থায় সুসময়েও বয়স্থা নাতিনীর সহিত স্ত্রীলোকশূন্য বাড়ীতে হিন্দু সমাজের কোন দাদা মহাশয় অত রসিকতার ঢলাঢলি করেন কি না সন্দেহ।

সরযূ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে গিয়াছিল, সে কেবল দুঃখের ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, যে পতির জন্য কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছিল, তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য নহে।

মৃচ্ছকটিকার বসন্তসেনা ও ভক্তমালের চিন্তামণির অদ্ভুত খিচুরী শান্তা গায়িকা বেশ্যা পশ্চিমে খুঁজিলে দুই একটা তায়েফ্ কদাচিৎ দেখা যাইতে পারে, যাহারা নর্ত্তকী ও গায়িকা, কিন্তু গণিকা নহে। শান্তার প্রাণে ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই জাগিত, কিন্তু সমাজ তাহাকে বেশ্যা থাকিতেই বাধ্য করিল। তাহার পিতাও তাহাকে গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। অতি দুঃখে সে সংসার ত্যাগ করিয়া জগজ্জননীর শরণাপন্ন হইল, মা ভবানীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইল, মহিমকেও উদ্ধার করিল। ভবানী কালীভক্ত, ভবানীর কন্যার কালী ভক্তি হওয়া স্বাভাবিক-- উহার ভিতরে নাটককার laws of he e lity দেখাইয়াছেন। অবস্থা ও শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বভাবোমূর্দ্ধি বর্ত্তে। হিরণ্ময়ীর উন্মাদের ছিট শান্তার ভিতরেও একটু আধটু 'প্রতিভার' আকারে ছিল বোধ হয়। কিন্তু শান্তার হাতে "পিস্তল দেখেনা," সে মহিমের জন্য পাগলিনী হইয়া সরযূকে খুন করিতে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাবিত হইল, গোপালবাবুর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিতে বলিল, ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, তাহার চরিত্র পাকা বেশ্যা-চরিত্র।

কবি শান্তার মুখে বলিয়াছেন, "বিবাহ? সেত রেজেষ্টরি করুলিয়ত লিখে নেওয়া—বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে নেওয়া।" বারবনিতার মুখের উপযুক্ত মন্তব্য। পরমুহূর্ত্তেই শান্তাকে বলিতে হইয়াছে, "অমার এই ক্ষীণ বাহুর বেষ্টন বন্ধন ছিঁড়ে আপনি চলে যাবেন।" এই শান্তা আবার ফণিনীর ন্যায় পার্ব্বতীকে বলিয়াছিল,

'তথাপি আমি বেশ্যা নই।'

শান্তার চরিত্র প্রহেলিকা, কবি স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই, সাধারণের সাধ্য কি বুঝিতে পারে? শান্তা নিজেও বুঝিত না, তাই সে দেবাঃ নজানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। গাহিয়াছিল জীবন 'শুধুই জীবন ধারণ।'

পতিতা গণিকার চরিত্র উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া সমাজের কি কোন উপকার হইবে? বরং তাহার বিপরীত ফল আশঙ্কা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংস্কার ও পতিতাশ্রমের কথা যদি নাটককারের মনে জাগরূক থাকে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

শান্তা ও ওস্তাদজীর কথোপকথন অত্যন্ত অনবধানতার সহিত লিখিত হইয়াছে। নিম্নে অশুদ্ধ ভাঙ্গা বাঙ্গালী-হিন্দীর দুই একটা নমুনা উদ্ধৃত হইল।

সমজগই, লেকেন উযো হামরা আদৎ হোগই, তোমারা হ'সই গীত হয়, মুস্কিলকা-বাত. বেচনেকা চীজ, মোলাকাৎ ভি কিনে,

খবরভি নহিলি! একঠো খৎ ভি নই ভেজা! ইত্যাদি। ওস্তাদজী স্ত্রী কি পুরুষ, ভাষা হইতে বুঝিবার সাধ্য নাই।

পারিপার্শ্বিক চরিত্র করুণাময়ী, পরেশ, পার্ব্বতী, দয়াল, কালীচরণ প্রভৃতি স্বাভাবিক এবং সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। করুণাময়ীর মৃত্যুর পর দয়াল মহিমের নিকট সংবাদ দিতে যাইয়া যেরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সে বাতুল বা থিয়েটারের অভিনেতা।

গ্রন্থকার নাট্যের ভিতরে পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্যজ্ঞানের মহান্ আদর্শ দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের মানব জাতির প্রতি কর্ত্তব্য, সরযূর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য, করুণাময়ীর পুত্রের কর্ত্তব্য, দয়ালের প্রতিবেশিনীর প্রতি কর্ত্তব্য, শাস্তার প্রণয়ী মহিমের ও মহিম-পত্নী সরযূর প্রতি কর্ত্তব্য, জেল-দারগার কয়েদীর প্রতি কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিশ্বেশ্বর মহিমকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সরযূকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছিলেন এবং ঔরসজাত পুত্রকেও ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের দিকে ও আপন আত্মার দিকে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে মাতৃমূর্ত্তি-করুণাময়ী ভিন্ন আর কেহ চাহিয়াছিলেন কি? ফাঁসির রজ্জু গলায় দিয়া 'এক দুই' বলা হইয়া গেলে শাস্তার আবির্ভাবে বিনা সেনাক্তে সরযূর ফাঁসি থামিতে পারে কি না, আইনজ্ঞ বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীরা বিবেচনা করিবেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, জগতে কি স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, স্থির করা কঠিন। আমরাও বলি, "truth is stranger than fiction."

পুস্তক পড়িবার সময় যে সকল গুণ চক্ষে ধরা পড়ে না, ও যে সকল দোষ চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, দৃশ্য-কাব্যের অভিনয়ের সময় নাট্যশালায় তাহা অন্যরূপ প্রতীয়মান হয়। এজন্য মনে হয়, মোটের উপর এ নাটক নাট্যমন্দিরে দর্শকগণের চিত্তরঞ্জন করিতে বিলক্ষণ সমর্থ হইবে।

৮৩। গৌড-রাজমালা, শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত, মূল্য ২৲।

এই পুস্তক বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি সঙ্কলিত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-সম্পাদিত গৌড় বিবরণের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড। স্থানান্তরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড-বিবরণ আট ভাগে বিভক্ত, যথা—রাজমালা, শিল্পকলা, বিবরণমালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ব, শ্রীমূর্ত্তি-তত্ব ও উপাসক সম্প্রদায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয় বাবুর লিখিত ভূমিকা অতি উপাদেয়, গবেষণাপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। গৌড রাজমালার অঙ্গে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। 'দেবমাতৃক' বরেন্দ্র-ভূমি বাঙ্গালীর অতীত গৌরবস্মৃতি বক্ষে লুকাইয়া অরণ্য-বসনাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়াছেন। বুকানন, কানিংহাম, রাভেন্সা, হণ্টার, বুকম্যান প্রভৃতি মহানুভব পাশ্চাত্য প্রত্নতত্বান্বেষীদিগের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি অক্লান্ত অধ্যবসায় বলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, "উপাদান অভাবকে আমাদের দেশের ইতিহাস না থাকার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অনুসন্ধান চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব।" ইহা অনেক পরিমাণে সত্য। কিন্তু তিনি আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির

"অনুসন্ধান ক্ষেত্র এবং অনুসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও অনুসন্ধানের ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই।" সমিতির চেষ্টায় ইতিমধ্যেই পুরাতন স্থাপত্যের, পুরাতন ভাস্কর্য্যের ও পুরাতন জ্ঞানধর্ম্মের, সভ্যতার নানা নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। আরও সৌভাগ্যের কথা, এই সকল উপাদান সাহায্যে ইতিহাস সম্পাদনের ভার যোগ্যতম হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা অতি কঠিন, ইতিহাস রচনা করা ততোধিক কঠিন। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠককে অক্ষয় বাবুর নিম্নোদ্ধৃত সারগর্ভ মন্তব্য পাঠ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। "ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবি কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর উপোদ্‌ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন,

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেবসরস্বতী॥

আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশ বাক্য এখনও সম্যক্ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক পরিমাণে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।"

আদিশূর বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একটী উপাধি, নাম নহে, ইহাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত। সম্পাদকও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। পাল ও সেনরাজগণ বঙ্গদেশে যতই ক্ষমতাদৃপ্ত হউন না কেন, ভারতেতিহাসে তাঁহাদের রাজত্ব ও 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থাভুক্ত। প্রজাপুঞ্জের রাজা নির্ব্বাচন করা পালবংশের ইতিহাসে নূতন ঘটনা হইলেও আমাদের ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অভিনব নহে। বৃজ্জিগণ মৌর্য্যসম্রাটদিগের নাসিকার পুরোভাগে প্রজাতন্ত্র রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু প্রজাশক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা জল্পনামাত্র।

যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পালবংশীয়দিগকে বাঙ্গালী বলা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। ঐতিহাসিকগণ এই প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গদেশকে পালদিগের 'জনক ভূমি' বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব এবং এক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের গৌরবের কারণ হইবে। অশোক ও হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি সম্রাটদিগেরও একাধিক 'জয়স্কন্ধাবার' ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কেহই মুখ্য-রাজধানী-শূন্য ছিলেন না। ভীমের জাঙ্গাল' সম্বন্ধে আমরা অক্ষয় বাবুর সহিত একমত হইতে না পারিয়া দুঃখিত। 'রমাবতীর' কথা সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইল। সুবিজ্ঞ মৈত্র মহাশয় বলিতেছেন,—

কিরূপে "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র বংশোদ্ভব" সেন রাজ-বংশ এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। সেনরাজগণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

বঙ্গের মুসলমান শাসনের সূত্রপাত সম্বন্ধে গ্রন্থকার প্রশংসনীয় স্বদেশ-প্রীতির বশীভূত হইয়া যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আস্থাযোগ্য প্রমাণাভাবে তাহা নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সম্পাদক তাঁহার ভূমিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় অসাধারণ ধৈর্য্য, নিরপেক্ষতা, বিচার-শক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থকার আয়াস-লব্ধ উপাদান হইতে ইতিহাস সঙ্কলনে তাঁহার অনুকরণ চেষ্টা করিলে গ্রন্থ অধিকতর মূল্যবান হইত। পরিশেষে অক্ষয় বাবুর আর একছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"বঙ্গভূমি যে বহু যুগের বহুবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলনভূমি—আপাত প্রতীয়মান মত-পার্থক্যের সমন্বয় ভূমি—অনন্য-সাধারণ স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সার কৌতূহলপূর্ণ সাধন-ভূমি, তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।"

ভগবান বরেন্দ্র-সমিতির সাধু চেষ্টার সহায় হউন। তাঁহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে দেবতার অশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

মানব-জীবনের দুঃখ-সমস্যা।

মানবের জীবন-সমস্যার মধ্যে এক অতি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা প্রতিনিয়ত মানব মনকে বিচলিত ও আন্দোলিত করিতেছে। সেই প্রহেলিকার গূঢ় রহস্য কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া মানব কত সময় ধর্ম্ম-বিশ্বাস হইতে স্খলিত ও বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং সংশয় ও নিরাশার গভীর আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া কতই আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। সে প্রহেলিকা আর কিছুই নহে, মানবজীবনের দুঃখ-সমস্যা।

মানব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন, অমিশ্র সুখ সম্ভোগ করিবে, রাজাধিরাজ বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গল-বিধাতার এমন আইন নয়। হর্ষের পাশে বিষাদ, বাসর-শয্যার অন্তরালে শব শয্যা, মিলনের উৎসবক্ষেত্রের উপকণ্ঠে বিচ্ছেদ ও বিসর্জ্জনের ঘননিবিড় ছায়াপাত, উল্লাস ও প্রমোদ-কোলাহলের একৈকদেশে শোক-সন্তাপের উচ্ছ্বলিত আর্ত্তনাদ, সূতিকা-গৃহের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ,আনন্দ-প্রদীপের পশ্চাতে শ্মশান-ক্ষেত্রের প্রজ্বলিত ভীষণ চিতা-বহ্নি,—এইরূপ বৈষম্যপূর্ণ, বিপরীত-ভাবাত্মক এক অলঙ্ঘ্য, অচ্ছেদ্য নিগড়ে মানুষ আমরণ বাঁধা। এইজন্য অনেক সময়েই মানব এইরূপই মনে করে যে, এই পৃথিবীটা যেন নিদারুণ শোক-সন্তাপ ও দুঃখ-যন্ত্রণার একটা বিস্তৃর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্র। মনে হয়, বুঝি এই জন্যই বিখ্যাত দার্শনিক শোপেন-হয়ার এই মর্ত্তধামকে একটা penal colony অর্থাৎ দণ্ডিত-অপরাধী বা দুঃখি-তাপি-গণের উপনিবেশ বলিয়াছেন।

আমাদের আত্মদুষ্কৃতিজনিত যে রোগ-শোক ও দুঃখ-পরিতাপ,তাহার মধ্যে নিজেদের অপরাধ, ও বিধাতার ন্যায় বিচার এবং আমা-দিগের শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা, অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাইয়া আমরা অতি সহজেই প্রবোধ প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা এমনও তো অনেক শোক-দুঃখ ও জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি, যাহার কারণ সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষ ভাবে নিজেদের কোন অপরাধের মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। নৈসর্গিক নিয়মে আমাদের যে সমুদয় অভাব ও অপূর্ণতা রহিয়াছে, তাহাও ত অনেক সময়েই আমা-দের মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এত-দ্ব্যতীত, আজ কোন প্রিয়জনের মৃত্যু, কাল কোন আকস্মিক উৎকট ব্যাধি-যন্ত্রণা, কখনো বা বিত্তনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, স্বজনের বিশ্বাস-ঘাতকতা, অকারণ অপবাদ ও নির্যাতন, এবং ঈদৃশ কত অভাবনীয় অগণিত ঘটনাবলি আমাদের হৃদয়মন আহত ও বিধ্বস্ত করিতেছে, মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্নপ্রায় করিয়া দিতেছে, সহস্র দাব-দহনে আমাদিগকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া আমা-দের দগ্ধহৃদয়োত্থিত হাহাকার আর্ত্তনাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে, এবং জীবনের পুষ্পাচ্ছাদিত উদ্যান-বর্ত্মকে কুশকন্টক কণ্টকা-কীর্ণ পথে পরিণত করিতেছে। কেন দুঃখ আসিতেছে, জানিনা, বুঝিনা, অথচ আসি-তেছে,—রুদ্ধবক্ষ হইতে কত উষ্ণশ্বাস উন্মো-চিত হইতেছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে,সুখের ক্ষীণপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে, আশার অরুণা-লোক নিরাশার তামসগর্ভে অস্তমিত ও বিলীন

হইতেছে, সকল ধর্ম্মভাব, সকল নির্ভর, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস—সমস্তই বন্যা-বিতাড়িত তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে একেবারে যুগান্তর, মনে হয় যেন এই জীবন অনন্ত মরণের নিবিড় ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইতেছে।

এই কি মানবজীবন? যদি তাহাই হয়, তবে শোপেনহয়ার যে এই পৃথিবীকে একটা penal colony বা অপরাধিদিগের উপনিবেশ বলিয়াছেন, তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কই, বিশ্বমানবের অন্তরাত্মা ত এই কথায় সায় দিতেছে না, বিশ্বমানব এই প্রশ্ন করিতেছে—মানুষ কি কুহেলিকাময় অদৃষ্ট বা নিয়তির হস্তস্থিত অতি তুচ্ছ ক্রীড়নক মাত্র? জীবনের বৈষম্য পূর্ণ অবস্থাবিপর্য্যয় কি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন? ইহার অভ্যন্তরীণ বিচিত্র ঘটনানিচয় কি কোন অতিমানুষিক বা অতিজাগতিক কর্তৃত্ব-প্রসূত নহে? সেই কর্তৃত্বের মালিক কি এতই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর? তাঁহার হৃদয় কি এমনই পাষাণে গঠিত? যে মানবের অন্তরে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের অদম্য অগস্ত্যপিপাসা, যাহার তৃষিত আত্মা ব্রহ্মাণ্ড শোষণ করিতে চায়, তাহার পরিণাম কি বিষাদ-অন্ধকারের মরুগর্ভ, বা নিরাশা অবিশ্বাসের নির্ব্বাণ-কোল?

এ প্রশ্নের একটা মীমাংসা প্রয়োজন, নহিলে এ জীবন শুধুই বিড়ম্বনা, শুধুই সন্তাপ, শুধুই ত্রাস। কিন্তু বিশ্বমানব ত এই দুর্লভ জীবনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে প্রস্তুত নহে, বিশ্বমানব এই চাহিতেছে যে ইহার ক্ষীণ আলোক বর্ত্তিকা যেন দুঃখ-পরীক্ষার ঝটিকায় নিষ্কম্প, নিস্পন্দ, থাকিতে সক্ষম হয়, যেন দুর্দ্দিনের ভীমপ্রভঞ্জন, শোক-সন্তাপের প্রলয় নিশ্বাস, ইহাকে কিছু মাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ না হয়।

তবে এই দুঃখের প্রতিষেধক কি? দুঃখ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন ইহা উপস্থিত হইলে ইহা সহন ও নিবারণের উপায় কি? এই সম্বন্ধে আজ অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

মানবজীবনের আদি ও অন্ত যেমন গভীর রহস্যপূর্ণ এবং আমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, তেমনই ইহার মধ্যভাগস্থিত আমাদের এই পার্থিব জীবিতকালও এক দুরধিগম্য প্রহেলিকার অনিশ্চিততায় সমাচ্ছাদিত। তাই এই সসীম, পরিমিতশক্তি মানবের জীবনের সহিত দুঃখের স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাই দুঃখ মানবের নিত্য-সহচর, তাহার অস্তিত্বের অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য আনুষঙ্গিক। দুঃখের ভাগ না থাকিলে মানবজীবন অপূর্ণ থাকিত, সুখের আস্বাদ ও আকর্ষণ,—অন্য কথায়,সুখের সুখত্ব, —তিরোহিত হইয়া যাইত। জড়ের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য শীতাতপ ও আলোক-অন্ধকার যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিধাতার সৃষ্টি-রহস্যে সুখ-দুঃখ,সম্পদ-বিপদ,প্রভৃতির চক্রবৎ আবর্ত্তন ও মানবাত্মার অনন্ত উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য তেমনই অপরিহার্য্য। দুঃখের ভিতর দিয়াই মানবের মনুষ্যত্বের বিবর্ত্তন ও পরিশেষে দেবত্বের উন্মেষ ও বিকাশ। দুঃখই মানবকে সসীম ছাড়াইয়া অসীমের দিকে উন্মুখ করে, দুঃখই যোজকরূপে স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যকে গ্রথিত করিয়া দেয়। তাই ত দুঃখের রাগিণীর আলাপে আমাদের হৃদয় এত সহজে বিগলিত ও মুখরিত হয়, বিষাদ-সঙ্গীত এত সহজে হৃদয়তন্ত্রীকে ঝঙ্কারিত করিয়া এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় চেতনায় জাগাইয়া তোলে। শোকেই ত শ্লোকের উৎপত্তি, সুপ্ত কবিত্বের ব্যক্ত উৎসারণ!

আর একটী ভাবিবার ও বুঝিবার কথা

এই—জীবনের কোন্ ঘটনা মানবের আয়ত্তাধীন? মানবের জন্ম, মৃত্যু, পরিণয়, উত্থান, অবস্থান ও ভোগ,—ইহাদের কোনটীর উপর তাহার কি কোন হাত আছে? এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে আমরা যে কিসে জীবিত রহিয়াছি তাহা কি আমরা জানি? তবে একদেশদর্শীর ন্যায় বিচার কেন? ইহা দেখিবার বিষয় নহে কি যে উদ্ভূত ঘটনা বিশেষ যে আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, তাহা ত একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তারই ইচ্ছায়? এই যে অমুক আমার দুঃখ-যন্ত্রণার মূলীভূত কারণরূপে প্রতীয়মান, সেই কারণের কার্য্য যে আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিল, তাহার পশ্চাতে কি বিধাতার হস্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান নহে? তিনি ত আমার দেহের বর্ম্ম ও আত্মার অক্ষয়-কবচ হইয়া আমাকে আবরিত করিয়া রহিয়াছেন, তিনি যদি অনুমতি না করেন, ইচ্ছা করিয়া পথ ছাড়িয়া না দেন, তবে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া মানবের পাপ-সম্ভূত কিম্বা অন্যবিধ কোন ঘটনা ত আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। পাপিষ্ঠগণের পাপ বুদ্ধি প্রসূত কার্য্য যে মহাত্মা ঈশার মৃত্যুর নিদান হইল, ইহা কাহার ইচ্ছায়? ইহা বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলবিধানে হইয়াছিল বলিয়াই ত ঈশা আজ পৃথিবীর সমক্ষে আলোকস্তম্ভরূপে শোভমান। সেই এক প্রভু, এক মঙ্গলবিধাতা ভিন্ন আমাদের উপর দ্বিতীয় কাহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, এই বিশ্বাসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিত্তকে স্থির, নিরুদ্বেগ ও আশ্বস্ত করাই দুঃখ-সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট অনুসরণীয় পন্থা। যিনি পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণমঙ্গল, তাঁহারই ইচ্ছায় নিখিল ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই বিশ্বাসের মহামন্ত্র সাধন করিতে পারিলে ঘটনাবিশেষের আঘাতজনিত বেদনার তীব্রতা তিরোহিত হইয়া যায়, ব্যথিত হৃদয়ে স্নিগ্ধ সান্ত্বনার শীতচন্দন প্রলিপ্ত হয়। তাঁহারই ইচ্ছার নিকট নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে না পারিলে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যিনি দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত সন্দর্শন করেন, তিনি যে কেবল তাহা নীরবে বহন করিতে পারেন, এমন নহে, তিনি দুঃখ আসিলে তাহাকে কোন বিশেষ মঙ্গলের অগ্রদূত মনে করিয়া আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হন, এবং ইহা অপেক্ষাও আশার কথা এই যে, এমন এক সময় আসে, যখন তিনি দুঃখকে দুঃখ বা নির্যাতন বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে করিতে পারেন না। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে।

দুঃখ স্বর্গের দূত, আমরা ইহাকে সেই ভাবেই বরণ করিব। মানবের কল্যাণের জন্য এই দেবদূত বিধাতার আদেশ ও নির্দ্দেশে নিত্যকাল গৃহে গৃহে অতিথি হইতেছে। ইহার নীরব মর্ম্মস্পর্শী প্রভাবে মোহ-মদিরা-বিভোর মানব কি চেতনা লাভ করিয়া নিজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে না? যে প্রিয়জনকে লাভ করিয়াছিল, সে কি সেই প্রিয়জনকে মৃত্যুর করাল কুক্ষিতে বিদায় দিয়া ভগ্নপ্রাণ হইয়াও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবে না যে, তাহার হৃদয় আর পূর্ব্ববৎ মরুভূমি সদৃশ শুষ্ক ও নীরস নাই, আজ স্বর্গের দূত ও বার্ত্তাবহের সঞ্জীবন স্পর্শে সে হৃদয় তৃণশষ্পশোভিত পুষ্প-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে? আজ হঠাৎ তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া গিয়াছে, দুঃখার্ত্ত শেলবিদ্ধ মানব আজ চমকিত হইয়া দেখিল—এ

জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ইহার সমস্তই পদ্মপত্রস্থিত জল-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, সম্মুখে অনন্তকালের অসীম বিস্তৃতি, সে সেই অনন্তকালের চরম-তীর্থের যাত্রী,—মানবাত্মার কি বিশাল সম্প্রসারণ আজ তাহার প্রথম অনুভূত হইল। সে দেখিল, যাহা সে হারাইয়াছে, তাহা হারায় নাই, অনন্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য সে তাহা লাভ করিয়াছে, তাহার সাতরাজার ধন হারাণ মাণিক মৃত্যুর পরপারে দাঁড়াইয়া মহামিলনের জন্য তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে; সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, মরণের তিমির যবনিকার অন্তরালে অনন্ত-মিলন, অনন্ত প্রসাদ, অনন্ত-উৎসব। আজ তাহার কত আসক্তি শিথিল হইল, কত মোহবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, প্রাণ-বিহঙ্গ পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্তের দিকে উধাও হইল। আজ সে বুঝিল, দুঃখই মানবের প্রকৃত বিশল্যকরণী, দুঃখেই আত্মার উৎসর্পণ, দুঃখই তাহার আভ্যুদয়িক, দুঃখই বিধাতৃচরণে তাহার সর্ব্বোচ্চ অর্ঘ্য।

বিধাতার এই যে অযাচিত দান, ইহাকে আমরা কেহ যেন অভিসম্পাত না করি, স্বর্গের বাহনরূপী এই আগন্তুককে যেন সকলেই বরণ করিয়া লই। স্বর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ না হইলে উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে না, মানবও তেমনিই দুঃখের প্রদীপ্তশিখায় দগ্ধীভূত না হইলে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয় না। একটী Dark-room বা অন্ধকারময় গৃহ না থাকিলে photograph বা আলোক-আলেখ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি কদাপি সম্ভব নহে; পিঞ্জরের বহির্দ্দেশ বসনের দ্বারা আবৃত না করিলে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহার ললিত কণ্ঠের সুমধুর স্বর-লহরী বিস্তার করিতে অভ্যস্ত হয় না। স্রোতস্বিনীর তীরদেশ এক দিকে না ভাঙ্গিলে অন্যদিকে গড়ে না, শস্য ক্ষেত্রকে বর্ষে বর্ষে না পোড়াইলে উত্তম ফসল উৎপন্ন হয় না, কণ্টকী বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাকে প্রতিবৎসর শ্রাবণ ভাদ্রে ছেদন না করিলে বৃক্ষের তেজ ও উৎকৃষ্ট ফল ধারণের শক্তি বর্দ্ধিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ভাস্কর যে প্রস্তরখণ্ডকে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের দ্বারা বিশেষ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহার উপর সে অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া থাকে। মানবের সম্বন্ধে বিধাতার অস্ত্র-প্রয়োগ ও কার্য্য ঠিক তেমনই, তিনি যাহাকে যত সুন্দর করিতে চাহেন, তাহার উপর ততই তীক্ষ্ণ অস্ত্র চালনা করিয়া থাকেন। প্রস্তর যেমন কোন রূপ উচ্চ বাচ্য না করিয়া স্বীয় দেহ কারিকরের হস্তে একেবারে ছাড়িয়া দেয়, মানবকেও তেমনিই নিজের সকল ইচ্ছারুচি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বকারিকরের হস্তে বুক পাতিয়া দিতে হইবে, তবেই দিব্য সুষমায় ভূষিত হইয়া তাহার জীবন সার্থক, সুন্দর ও সফল হইবে।

তবে হে দুঃখি, তুমি আর শোক করিও না, এ সংসার সন্তপ্ত বা অভিসপ্তদিগের উপনিবেশ বা কারাগার নহে, ইহা তোমার ভবিষ্য-জীবনের আনন্দ-লোকের সূতিকা-গৃহ। এখানে তুমি যে বিধাতার চিহ্নিত সন্তান হইয়াছ, এই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। তোমার জীবনে কে অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে তাঁহার লীলাস্থলী করিয়াছেন, ইহার অন্তঃপুরে কে অধিবাস করিতেছেন, একবার দর্শন কর। "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্", এই বলিয়া তাঁহার নিকট মস্তক অবনত কর, তোমার ভগ্নপ্রাণ সুস্থ ও সবল হইবে, তোমার জীবনপথ আশাকুসুমাস্তীর্ণ হইবে, ও তোমার আঁধার গৃহে আলোক ফুটিয়া হৃদয়ের শুষ্ক মালঞ্চে নবীন সাজে নব বসন্ত ডাকিয়া আনিবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

শরত-প্রভাতে।

প্রস্ফুট সোণার পদ্ম সম শরতের এ অম্লান উষা
নীলাম্বর-সরোবরে, উঠেছে ফুটিয়া অকলুষা।

বিলসিছে চারিধারে অভিরাম দিব্য, শ্যাম শোভা,
ঝলিছে প্রকৃতি-কণ্ঠে শিশির-মালিকা মনোলোভা।
ঝির্-ঝির্ শ্রান্তিহরা বহে ধীর, সুগন্ধি সমীর,
তা'রি মাঝে ভেসে' আসে জননীর আগমনী-তান।
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিছে পাপিয়ার উদাত্ত আহ্বান।
আনন্দের শিহরণে কি রোমাঞ্চ আজি প্রকৃতির।

পরিপূর্ণ লাবণ্যের পুণ্য, এহি স্বচ্ছ সরোবরে
স্নান ক'রি', আজি মোর এ অন্তরে আনন্দ না ধরে!
ওরে তোরা থাম্, থাম্! একবার দেখ্ শুধু চাহি'—
দুলিছে কি সুধা-সিন্ধু। আনন্দের এযে সীমা নাহি।
তোরা মোরে ছেড়ে' দেয়ে। আজি আমি করি শুধু পান
এই রূপ-গন্ধ-গীতি, এই হাসি, পূরিয়া পরাণ।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বিজয়া।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য ববান্নিবোধত।

কঠ ৩, ৪.

অভিবাদন, সম্ভাষণ, প্রণিপাত, আশীর্ব্বাদ, কোলাকুলি—এবাব বিজযা ফুবাইযা গেল। প্রতিবৎসব যেমন কবিয়া আসে, আবাব চলিযা যায়, তেমনি এবাবও 'বিজযা' আসিয়াছিল, আবাব চলিয়া গিযাছে। আশ্বিন মাসে নযনলোভা সবুজ-ববণ ধানেব ক্ষেতে যেমন বাতাসেব তবঙ্গ আসিয়া হেলিয়া দুলিযা ধানগাছ নাচাইযা শূন্যে মিশিয়া যায়, সেই রূপ বিজযা আসিযা বঙ্গেব গৃহে গৃহে আনন্দ-লহরী ছুটাইয়া, কোটি প্রাণ নাচাইয়া কোথায নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল? প্রতিপদে যাহাব সঙ্কল্প, ষষ্ঠীতে যাহাব বোধন, দশমীতে তাহাব বিসর্জ্জন হইয়া গিযাছে। শক্তি-সাধনায় মহামাযা-পূজায় বঙ্গ-নবনাবীব 'বিজয়া'বব লাভ হইয়াছে কি? ভিতবে বাহিবে আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া 'ছিন্নবেশ মলিন মুখ' পবিহাব কবিয়া আমাদেব নূতন বেশ নূতনভূষা ধারণ সার্থক হইয়াছে কি? পুবাতন হিংসা, দ্বেষ, রাগ, লোভ, অধীবতা, পরনিন্দা ও পবশ্রীকাতরতা ত্যাগ কবিযা আমরা বিজয়ার দিনে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রেম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও সহানুভূতিব নব-সাজে সজ্জিত হইযাছি কি? পুরাতন আলস্য, জড়তা ও দায়িত্বহীনতার পরিবর্ত্তে নূতন চেষ্টা, উদ্যোগ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমাদের অঙ্গের আভরণ হইয়াছে কি? পুরাতন ক্ষুদ্রতা, কলহ, স্বার্থ ও পরপীড়ার কলঙ্ক ধৌত কবিয়া নূতন মহত্ত্ব, প্রীতি, ঐক্য, পরার্থ, ও পরোপকাবের সুগন্ধ অনুলেপ অঙ্গে বিলেপন কবিতে পাবিয়াছি কি? পুরাতন বোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ ও অশান্তির আঁধাব নাশ কবিযা নূতন স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, সন্তোষ ও আনন্দেব আলোক প্রাণের মন্দিরে জ্বালিতে পাবিয়াছি কি? যদি পারিয়া থাকি, আমাদের শক্তি-পূজা সার্থক হইয়াছে। আমরা বিজয়ার বিজয় সারা বৎসর গাহিব।

মা আসিয়াছিলেন, আমাদের পুরাতন দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠা কবিতে। মা আসিয়াছিলেন, আমাদের পাপ

ধ্বংস করিয়া পুণ্যের জয় ঘোষণা করিতে। মা আসিয়াছিলেন, আমাদের জীবনে তমো ভাবের সংহার করিয়া রজোগুণের ওজঃ সঞ্চার করিতে। একদিকে বর্ষার ধারা, অন্যদিকে শীতের কুয়াসা, মধ্যস্থলে মা জগজ্জননী শারদ আকাশে চাঁদের হাসিতে হাসিয়া বলিলেন 'মাভৈঃ।' গঙ্গার জল কুল-কুল নাদে বলিল মাভৈঃ। গাছের পাতা সর সর রবে কহিল মাভৈঃ। সাগরে, কাননে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে প্রতিধ্বনি হইল মাভৈঃ। কিন্তু তামসিক বাঙ্গালীর রোগ-ভগ্ন, পাপজীর্ণ, চিন্তাশুষ্ক কাতর প্রাণের আঁধার কোণে মায়ের সে সিংহনাদের প্রতি-নাদ হইয়াছে কি?

প্রাচীন কালে একবার মা আসিয়া-ছিলেন, বিজয়-দৃপ্ত অহংমত্ত দেবতাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে। ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন, 'এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।'

ব্রহ্মণোবিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। কে, উ, ১৪।

ব্রহ্মরূপিণী মা আবির্ভূতা হইয়া বলি-লেন, 'মূর্খ, তোরা। ব্রহ্মের বিজয়েই বিজয়ী হইয়াছিস্।'

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজাগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। কে, উ, ২৫।২৬॥

তিনি সেই আকাশে সেই স্ত্রীরূপিণী অতি সৌন্দর্য্যময়ী হৈমবতী উমার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পূজ-নীয়স্বরূপ কে? তিনি বলিলেন, 'ইনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা এরূপ মহি-মান্বিত হইয়াছ।' ইত্যাদি।

আর একবার মা আসিয়াছিলেন, রাজ্য-চ্যুত নরনাথ সুরথ ও বিষয়-বিরক্ত বৈশ্যের আহ্বানে তাঁহাদিগকে বরদান করিতে। তাঁহারা অনাহারে ও সংযতাহারে তন্মন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বদেহশোণিত বলিদান করিয়া জননীর আরাধনা করিয়াছিলেন। জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা পরিতুষ্টা হইয়া সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইলেন এবং কহিলেন,—হে রাজন্. অল্পদিনেই তুমি শত্রুগণকে বধ করিয়া স্বীয় রাজ্য লাভ করিবে। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ। আমার নিকট তুমি যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহা দিতেছি; নির্ব্বাণ-মোক্ষের জন্য তোমার জ্ঞান হইবে।

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্॥
ইত্যাদি।

বৈশ্যবর্য্যত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ॥
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥
চণ্ডী, দেবীমাহাত্ম্যম্, ১৩। ২২, ২৪, ২৫।

আবারও মা দশভুজা আসিয়াছিলেন, আর্ত্ত সন্তানের কাতর আহ্বানে শরৎকালে দশানন সংহার করিতে। রাজ্যচ্যুত রাম অত্যাচারী রমণীচোর দুষ্টরাবণকে উচিত শাস্তি দিতে মিষ্টব্যবহারে বনের বানর বশীভূত করিয়া সাগরে জাঙ্গাল বাঁধিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তি-সাধন না হইলে দিগ্বিজয়ী বীর লঙ্কেশ্বরকে নিধন করিতে পারা যাইবে না। তাই বীরকুমার দাশরথি অকালে বোধন করিয়া অষ্টোত্তরশত শতদলে মহামায়ার চরণপূজা করিলেন। এক কমল অভাবে সংকল্পভঙ্গভয়ে কমলনয়ন রাম তীরধনু লইয়া নীলচক্ষু উৎপাটন করিয়া

দেবীর চরণে অঞ্জলী দিয়া সংকল্প পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন।

কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
একচক্ষু দিব আমি সংকল্প পূরণে॥
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান॥

কৃত্তিবাস।

ভগবতী প্রসন্না হইলেন। মা সশরীরে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'বৎস। বরং বৃণু।' রাঘব করজোড়ে মাগিলেন, 'জয়ং দেহি।'

এমন কঠোর সাধনা না হইলে কি কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায়? আমাদের কি সাধনা আসিবে না, আমরা কি চিরদিন এমনই থাকিব? প্রতি বৎসরই শরৎ আসিতেছে, শক্তিপূজার অবসর আসিতেছে, আমরা বীজমন্ত্রে অভিষেক করিয়া সুপ্তচেতনা প্রবুদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাইতেছি। আমাদের প্রাণ ত পাপের মরণ হইতে পুণ্যের জীবন-পথে জাগিতেছে না। কত বিজয়া বৎসর বৎসর জয়ধ্বনি করিয়া চলিয়া গেল, আমাদের অন্তরের ও বাহিরের সংগ্রামেত বিজয়লাভ হইতেছে না। আমরা মধুকৈটভভীত ব্রহ্মার ন্যায় শুদ্ধসংযত হইয়া কাতর প্রাণে জননীকে একদিনও বলি নাই—

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধ লক্ষণা।

(চণ্ডী, প্র, ৮, ৭৯)

এবং আমাদের সম্মুখে চেতনা জাগাইতে যোগনিদ্রাদেবীর আবির্ভাবও কখনও হয় নাই। আমরা মহিষাসুর কর্ত্তৃক নিগৃহীত ক্ষুব্ধ দেবগণের ন্যায় অনন্যগতি হইয়া আপৎকালে মধুসূদনের নাম লইতে পারি নাই। সুতরাং জননীর সেই মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই, যাহা—

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালা ব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥

(চ, মধ্য, ১, ১২,)

আমরা শুম্ভনিশুম্ভ কর্ত্তৃক ভ্রষ্টরাজ্য, হৃতাধিকার দেবতাদিগের ন্যায় প্রকর্ষ ভক্তিশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক বিষ্ণুমায়ার স্তব করিতে পারি নাই।—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।

* * * * *

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

(চ, উ, ১, ৯)

অতএব স্তবে তন্ময়া হইয়া মা পার্ব্বতী আমাদিগকে বর দিতে কখনও আসেন নাই। আমরা যদি ডাকের মত, ডাকতে পারিতাম, তবে কি মা এমন করে লুকাইয়া থাকিতে পারিতেন? আমরা আমাদের পাপ লইয়া, দুর্ব্বলতা লইয়া, কলঙ্ক লইয়া, হীনতা ও দীনতা লইয়া, চিরদিন যেমন তেমনই রহিয়াছি। হায়! আমাদের অন্তঃসারশূন্য পাশব তাণ্ডব দেখিয়া অট্টহাসি হাসিয়া 'পরিপূর্ণ চন্দ্র বিম্বানুকারি কণকোত্তম কান্তি' জননীমূর্ত্তি কালী করালীরূপ ধারণ করিয়া কার্ত্তিক অমাবস্যার অন্ধকারে তিরোহিত হইতেছেন।

এখনও যদি আমরা একধ্যান, একমন, একপ্রাণ হইয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মা সর্ব্বমঙ্গলার আরাধনা করিতে পারি, তবে শক্তি আসিবে, ভক্তি আসিবে, মুক্তি আসিবে, ধন আসিবে, জ্ঞান আসিবে, গণেশরূপে সিদ্ধি আসিবে, সিংহরূপী বীর্য্য আসিবে—মাতৃপূজা সফল হইবে। আমাদের বিজয়লাভ হইবে। তাহা যদি না পারি, বিলাসের ও প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাঙ্গামনে ভাঙ্গাপ্রাণে ললাটে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আলস্যের মোহে বিভোর হইয়া ষড়রিপুর তাড়নায়

চরিত্র হারাইয়া আমরা যদি মাতৃপূজার ভাণ করি, তাহা কেবল সর্ব্বনাশের সেতু। তামসিক বৃত্তির বশীভূত হইয়া হুজুগে মাতিয়া আমোদ করিয়া নাম কিনিতে বা মনে মনে বৃথা গর্ব্বের জঞ্জাল বাড়াইতে আমরা যদি মাটী কাঠ ও খড়ের মূর্ত্তি গড়িয়া রাং সালুক দিয়া সাজাইয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াই ঢাক ঢোল বাজাইয়া থিয়েটার করি, তাহার ফল শক্তিসাধন নহে, শক্তিনাশ, বিজয় নহে, পরাজয়। যে সাধনাশূন্য, কৃত্রিম, তামসিক পূজার পরিণাম কেবল দশমীতে ঐ সুরধুনীর সলিলে মাতৃমূর্ত্তির বিসর্জ্জন। সেই জন্যই বুঝি বাঙ্গালীরা যে বোধন করে, তাহার "বিজয়া" কেবল শূন্য, আঁধার, শক্তিহীন বিসর্জ্জন !

শ্রীরসিকলাল রায়।

প্রসাদী-ফুল। (৫)

বিকাশ ও বিকার।

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একদিন নিবেদন করিলাম যে, তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন লইয়া লোকেরা অনেক কথা বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ অনেকে বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করে যে, ইহা একরূপ মানসিক চাঞ্চল্যের ফল, মতের বিকার।

তিনি উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "লোকেরা কি বলিবে কি না বলিবে, ইহা ভাবিয়া চলা যায় না, লোকের মন যোগাইয়া চলা এককথা, আর সত্যের সম্মান রক্ষা করা অন্য কথা। যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি।"

যে পথিক্ একলক্ষ্যে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছেন, কখন অত্যুচ্চ পর্ব্বত, কখন গভীর গহ্বর, কখন সমতল ক্ষেত্র, কখন পুষ্পোদ্যান এবং কখনও মরুভূমি তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে; যখন যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বলিতেছেন, লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তিনি কি বলিবেন যে, সকলই একরূপ দেখা যাইতেছে? লোকেরা যখন বলিবে যে, তুমি একবার বলিতেছ পুষ্পোদ্যান, আবার বলিতেছ মরুভূমি, তোমার কথার কিছু ঠিক নাই, তখন তিনি বলিবেন, আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি, তোমাদের অনুরোধে অথবা কোন মতের অনুরোধে কিম্বা পূর্ব্ব কথার সহিত মিল রাখার অনুরোধে আমি সত্য গোপন করিতে পারি না।*

* পাশ্চাত্য ঋষি Emerson বলিয়াছেন,—

"A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines With consistency a great soul has simply nothing to do He may as well concern himself with his shadow on the wall Speak what you think now in hard words, and to-morrow speak what tomorrow thinks in hard words *again, though it contradict everything* you said today, 'Ah', so you shall be sure to be misunderstood', Is it so bad, then, to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton and every pure and wise spirit that ever look flesh To be great is to be misunderstood"—Emerson's Essays—Self-Reliance

অর্থাৎ পাছে আগাগোড়া মতের মিল না থাকে, দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগের মনে ভূতের ভয়ের মত এইরূপ একটা ভয় আছে। রাজনৈতিক (Statesman), দার্শ-

আবার কেহ যদি বলে, "কৈ আমিত এতকাল ধরিয়া দেখিতেছি, কিন্তু আমাবত দৃশ্যেব পবিবর্ত্তন হইতেছে না, আমিত বিভিন্ন কিছুই দেখিতেছি না।" এ কথাব উত্তবে তিনি বলিবেন যে, আমিও বহুকাল তোমাব মতন একবস্তুই দেখিয়াছি, তখন মনে কবিয়াছি, এই দৃশ্যেব আব পবিবর্ত্তন হইবে না, ইহাই একমাত্র সত্য ও সনাতন, কিন্তু পবে আবও চলিতে চলিতে বিভিন্ন দৃশ্য সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। অবশেষে দেখিলাম, বৈপবীত্য কোথাও নাই, যাহা আছে, তাহা বিচিত্রতা মাত্র, সেই সমস্ত বিচিত্র লইয়া একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দব দৃশ্য দেখিলাম, পূর্ব্বে যাহা দেখিযাছিলাম, উহা অংশমাত্র, পবে যাহা দেখিলাম, তাহা সমগ্র, পূর্ব্বেব বস্তু ধর্ম্মাঙ্গ, পরেব বস্তু ধর্ম্ম।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বাবা কথাটীকে বিশদ কবিতে চেষ্টা কবিব। ঐ যে বৃহৎ বৃক্ষটী দেখা যাইতেছে, উহাব নাম মহুযা বৃক্ষ। উহাব মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ও ফল, এই সমস্ত উক্ত বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অথবা ঐ সমস্ত লইয়াই উহাব বৃক্ষত্ব।

এখন বিচার কব। এই বৃক্ষেব ত্বকের স্বাদ অত্যন্ত কটু, ফুলেব স্বাদ বড়ই মধুর, ফলেব স্বাদ অতিশয় তিক্ত; এই ছাল, ফল, ও ফুল যে একই বস্তুব অভিব্যক্তি বা বিকাশ, কিছুতেই তুমি তাহা অস্বীকার কবিতে পারিবে না। ছাল বলিবে আমি কটু, ফুল বলিবে আমি মধুব, ফল বলিবে আমি তিক্ত, আর যদি বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা কব, সে কি বলিবে? সে বলিবে, কটু, তিক্ত, মধুব, তিনই আমি। আবাব আকৃতিব বিভিন্নতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলে কেহ বলিবে, আমি মূল, কেহ বলিবে আমি কাণ্ড, কেহ বলিবে আমি পত্র, কেহ বলিবে আমি ফুল, কেহ বলিবে আমি ফল, আব বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা কবিলে সে কি বলিবে? সে বলিবে, এই মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল সমস্ত লইয়া আমিই সমগ্র বৃক্ষ। ইহাবা খণ্ড, আমি অখণ্ড, ইহাবা অংশ, আমি সমগ্র; আমাকে না জানিয়া যতক্ষণ খণ্ডভাবে ইহাদিগকে জানিবে, ততক্ষণ তোমাব ভেদবুদ্ধি থাকিবে, তুমি এক হইতে অন্যকে স্বতন্ত্র দেখিবে।

ব্যবহাবিক জ্ঞানে তিক্ত আব মধুর কি বিভিন্ন বস নহে? কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, একই বস্তুব ক্রমবিকাশে কটু, মধুর ও তিক্তবস উৎপন্ন হইতেছে। তুমি অভ্র দেখিযাছ? গোলাপী বর্ণেব একখানা অভ্রকে যদি পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিয়া পাতলা কব, তবে সেই পাতলা পাতাগুলি শ্বেতবর্ণ ধাবণ কবিবে, আবাব যদি অনেকগুলি গোলাপী বর্ণেব অভ্র একসঙ্গে কবিয়া মোটা একটা চাপ প্রস্তুত কর, তবে সেই চাপটী কৃষ্ণবর্ণ ধাবণ কবিবে। এইরূপ রঙ্গেব খেলা অনেক বস্তুতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মহুয়া বৃক্ষটী এবং অভ্র প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থূলচক্ষুর দৃশ্য, এজন্য উহাদেব রস ও

নিক এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা অল্পপ্রাণ, তাঁহারা এই ভযে ভীত থাকেন। মহাত্মাগণ এই ভযের ধার ধারেন না। প্রাচীরের গাত্রে পতিত আপন ছায়ার সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, আগাগোড়া মতের মিল (consistency) রাখা না রাখার সহিতও তাহাদের সেই সম্বন্ধ। আজ যাহা ঠিক বুঝিয়াছ, সজোরে তাহা প্রকাশ কর এবং কল্যকাব মত যদি অদ্যকাব মতের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তাহাও সজোবে প্রকাশ কর। তোমাকে লোকেরা নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবে, কিন্তু এইরূপ ভুল বুঝা কি বড়ই মন্দ? পিথাগোরস্, সক্রেটিস্, যীশুখ্রীষ্ট, লুথার, কপারনিকাশ, গ্যালিলিও, নিউটন, ইত্যাদি সমস্ত দেহধারী পবিত্রাত্মা জ্ঞানিগণকেই (Misunderstood) লোকেরা ভুল বুঝিয়াছেন। মহাপুরুষ মাত্রকেই লোকেরা ভুল বুঝিয়া থাকে।

রঙ্গের পরিবর্ত্তনের ধারা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সাধকের মানসিক ব্যাপার গুলি এরূপ স্থূলচক্ষুর দৃশ্য বিষয় নহে, এজন্যই যতটুকু তোমার অভিজ্ঞতার আয়ত্ত, তাহার একটু ব্যতিক্রম দেখিলেই তুমি সিদ্ধান্ত করিয়া লও যে, অপর দ্রষ্টা যাহা বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা, কেননা কটু কখন মধুর হয় না, মধুর কখন তিক্ত হয় না, এবং লাল কখন শাদা হয় না, শাদা কখন কাল হয় না। তোমার এই ভ্রান্ত ধারণা স্থূল বস্তুতে পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইলেও তোমার সংস্কার উহাকে পরিত্যাগ করে না, তাই তুমি যাহা দেখ নাই, সে বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নাই, যথাসাধ্য জোর করিয়া তাহার সমালোচনা করিতেছ। যে কখনও করকা কিম্বা বরফ দেখে নাই, তরল জলের যে একটা কঠিন মূর্ত্তি আছে, তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, জলের ধাক্কা খাইয়া যে জাহাজ ডুবিতে পারে, এরূপ কথাকে সে পাগলের প্রলাপ মনে করে। সূর্য্য-রশ্মিতে, সমুদ্র হইতে, আকৃষ্ট হইয়া যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা (আমাদের চক্ষে) নিরাকার, তাহা হইতে যে মেঘ জন্মে, তাহা সাকার হইলেও অস্পর্শ, সেই মেঘ যখন বারি হয়, তখন উহা আমাদের তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, সেই জল যখন শিলা হয়, তখন আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে সম্ভোগ করি। দেখিলেত নিরাকার বাষ্পের সাকার মূর্ত্তি কেমন স্তরে স্তরে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়াই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক সাধকবর কাঙ্গাল-ফিকির (৺হরিনাথ মজুমদার) স্ব-রচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"তোমায় আজ ঘন হতে হ'লো। পাতল পাতল থাক্‌লে কেবল পিপাসা কি যায় হে বল? তোমায় ঘন হ'তে হ'লো" ইত্যাদি। ভগবানের চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি, আনন্দঘন মূর্ত্তি নিরাকার (nothing) নহে, উহা সাধকের প্রত্যক্ষ প্রাণের বস্তু, তাঁহাকে প্রাণে না পাইয়া শুনিয়া, মুখস্থ করিয়া আওড়াইলে কিছুদিন পরেই শব্দগুলি পুরাতন হইয়া যায়, কেন না যে বস্তুর সঙ্গে যাহার সাক্ষাৎ নাই, তাহার ধ্যান তাহার পক্ষে অসম্ভব। বন্ধ্যা নারীর পুত্র-স্নেহের ন্যায় বাস্তবিক উহা অবস্তু।

বাষ্পকে দেখা যায় না, উহা শুধু অনুমান-সিদ্ধ বস্তু, মেঘকে দেখা যায় বটে, কিন্তু ধরা যায় না, অঞ্জলীতে কিম্বা কোনরূপ পাত্রে ন্যস্ত করা যায় না এবং উহাকে পান করাও চলে না; জলকে ধরা যায়, পান করা যায়, কিন্তু উহার বর্ণ কিরূপ, তাহা জানা যায় না, করকা কিম্বা বরফকে ধরা যায় এবং উহার বর্ণও প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং নিরাকার বাষ্প যতই ঘন হইতে লাগিল, ততই উহা সাকার হইয়া জীবের বিবিধ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইল। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে তৃষিত, সে শুধু বাষ্পের চিন্তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই সাধক গাহিয়াছেন, "তোমায় ঘন হ'তে হ'লো"। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, বাষ্প হইতে বরফ পর্য্যন্ত বাষ্পের এই যে বিবিধ প্রকারের অভিব্যক্তি, উহা তাহার বিকাশ না বিকার?

যিনি বাষ্পতত্ত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন, তিনি যদি বলেন যে, উহা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, সে কথা সত্য কথা। আবার যিনি বাষ্প হইতে বরফ পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যদি বলেন যে, উহা সাকারও বটে নিরাকারও বটে, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ বটে, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপভোগ্যও বটে, তাঁহার সে কথাও সত্য কথা।

ঋষিরা তাঁহাকে অনাবৃত বলিয়াছেন এবং অণুপ্রবিষ্ট বলিয়াছেন এবং অণু হইতেও অণু, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ বলিয়াছেন, "কথংতদুপলভ্যতে"বলিয়াছেন,আবার হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় উপলব্ধি করিয়াছেন, "অনন্তরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি"তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত হন। নামানন্দ, কীর্ত্তনানন্দ, অপার্থিব বস্তু হইলেও উহা তাঁহার মূর্ত্তি নহে, তাঁহার "আনন্দঘন মূর্ত্তি" আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কোন সাধকের প্রশ্নের উত্তরে নিজহাতে লিখিয়া দিয়াছেন,"বিষয়রস বিন্দুমাত্র থাকিতে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না"। এক মহিলার ১৮ (আঠার) ঘণ্টা ইচ্ছা-সমাধির কথা শুনিয়া বলিলেন "এ অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে নাই। এই সমাধি নামানন্দের সমাধি, এই আনন্দ চুষিয়া চুষিয়া আত্মা নিষ্পাপ হয়, তখন সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আপনি প্রাণে প্রকাশিত হন"। ইহার পরে এই মহিলা একদিন একাসনে ৩২ ঘণ্টা সমাধিস্থা থাকিয়া বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর আমাকে বুকে করিয়া আছেন।" সে দিন হইতে উদ্দেশে পূজা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ পূজা আরম্ভ হইল। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা আরও দূরের কথা। তখন ঈশ্বর সাকার হইয়া সাধকের সঙ্গে নানা প্রকারের লীলা করেন। আমরা নিম্নস্তরের লোক, প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধির অভাবে উদ্দেশে পূজা করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ মনে করি—এবং আপনার অবস্থাকে মাপকাঠি করিয়া অন্যের পরিমাণ করিয়া থাকি।

"কিছু না" হইতে "কিছু" হয় না, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর কিছু না (nothing) নহেন, তিনি অবশ্যই "কিছু"। অগোচর যে গোচর হয় না, নিরাকার যে সাকার হয়না, সূক্ষ্ম যে স্থূল হয় না, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। অগোচর বাষ্প কেমন করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গোচর (বরফ) হইল? যদি বল "তখন তাহার অগোচরত্ব, নিরাকারত্ব থাকিল না,সুতরাং স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইল। ঈশ্বর "অব্যয়" তাহাতে কি পরিবর্ত্তন সম্ভবে?" এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর এই যে, জড় পদার্থ একই সময় একই ব্যক্তির নিকট "গোচর" ও "অগোচর" হইতে পারে না, একথা সত্য; যদি ধরিয়া লও যে ভগবানের কোন "অচিন্ত্য" শক্তি" নাই, তথাপি দোষ হয় না, কেননা তিনি "একই ব্যক্তির" নিকট "একই সময়ে" গোচর ও অগোচর হইতেছেন না, একই সময় এক ব্যক্তির গোচর ও অন্যের নিকট অগোচর হইতেছেন এবং কখন একই ব্যক্তির নিকট এক সময়ে গোচর ও অন্য সময়ে অগোচর হইতেছেন, ইহার মধ্যে স্ববিরোধীতা দোষ কোথাও ঘটিতেছেনা। যদি বল, তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তনে "অব্যয়ত্ব" বিনষ্ট হইল, সে কথার উত্তর এই যে, তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, তাঁহার যে আকার তোমার অগোচর ছিল, তাহাই তোমার গোচর হইল, তাঁহার পরিবর্ত্তন কিছুই হইল না। যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু তোমার ব্যবহারিক দৃষ্টির অগোচরে আছে, যন্ত্র সহযোগে সে সকল তোমার প্রত্যক্ষ হইলে তুমি বলিতে পার না যে, নিরাকার জীবাণু সাকার হইল। তোমার গোচর হইল বটে, কিন্তু উহা যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। পরমেশ্বর যে প্রত্যক্ষ হন, আস্তিক্য বুদ্ধির অভাব বশতঃ আমরা

তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাই কখনও উপাসনা-জনিত আনন্দকে তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া মনে করি, কখনও কতকগুলি দার্শনিক মতকে ঈশ্বর বিশ্বাস বলিয়া ঘোষণা করি, কখন বা নিজের অভিপ্রায়কে প্রত্যাদেশ মনে করিয়া নিজেই প্রবঞ্চিত হই। ভগবান্ যে শব্দ করিয়া কথা কহিতে পারেন, সাকার রূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করিবার উপযোগী আস্তিক্য বুদ্ধি নাই। এরূপ ধর্মভাব নাস্তিকতা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত আস্তিকতা নহে, ভগবানের স্পষ্ট ব্যক্তিত্বে অবিশ্বাস গূঢ়রূপে উহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দেশ বিদেশের ঋষিগণ, মহাপুরুষগণ ও অবতারগণ এ বিষয় যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধির অভাব বশতঃ আমরা যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিনা, শুধু তাহা নহে, অহঙ্কারে তাহাদিগকে কুসংস্কারী বলিয়া ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না।

অগ্রে বিদেশের কথা বলিয়া পরে স্ব-দেশের কথা বলিব। মুসা একটা ঝোপের মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইব্রাহিম ঈশ্বরকে দেখিলেন, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলেন এবং পরমেশ্বরের হুকুম পাইয়া আপনার একমাত্র পুত্রকে দেবতার নিকট বলি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সুতরাং তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ কিরূপ সুস্পষ্ট, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। * যোগীবর ঈশা তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও নিরাকার নহে। হজরৎ মহম্মদ, তাঁহার আল্লার সহিত সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন এবং সমস্ত কোরাণ গ্রন্থখানি আল্লা তাঁহাকে অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট শব্দ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

ভারতীয় ঋষি ও ভক্তগণ তিনরূপে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে তিনটীরূপ—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্মকে জ্ঞানে, আত্মাকে ধ্যানে এবং ভগবানকে অন্তরে বাহিরে জ্ঞানচক্ষে ও চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞানের আধার ছিলেন। তাঁহার সময়ে যাঁহারা বড় বড় বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তিনি ব্রহ্মবিচারে তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী কে ছিল? প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। এ হেন জ্ঞানী শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি জটিল ব্রহ্মতত্ত্বের চরম মীমাংসা "অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন যে, গোপাল বিগ্রহ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বহুদূর হাটিয়া আসিয়াছেন, এবং সেইজন্যই তাঁহার "সাক্ষীগোপাল"

*কেহ মনে করিতে পারেন যে এরূপ আদেশ কখনও সঙ্গত নহে এবং ঈশ্বর যে ইব্রাহিমের বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না, কেননা, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কি ইব্রাহিমের মনের অবস্থা পরীক্ষা না করিয়া বুঝিতে পারিতেন না? এইরূপ সংশয় নিরসনের যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্তু এস্থলে সে চেষ্টা না করিয়া শুধু সংক্ষেপে একটা কথা বলি। কথাটা এই যে, ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য যুগে যুগে ভগবান্ এইরূপ লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি ইব্রাহিমের হৃদয় জানিতেন না বলিয়া পরীক্ষা করেন নাই, জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করিয়াছেন।

নাম হইল। ব্রহ্মজ্ঞানিগণ দলে দলে মহাপ্রভুব শিষ্যত্ব স্বীকাব মবিযা সাকাব বাধাকৃষ্ণেব উপাসক হইলেন, তাঁহাদেব মত পরিবর্ত্তনেব কৈফিয়ৎ অতি অপূর্ব্ব, যথা,—

"অদ্বৈতবীথী পথিকৈ রুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধ দীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ইহাব তাৎপর্য্য এই যে, আমবা আত্মানন্দ (ব্রহ্মানন্দ) সম্ভোগ কবিতে ২ অদ্বৈত পথেব পথিক-দিগেব সহিত চলিয়াছিলাম, বাস্তায কোন এক শঠ গোপবধূ চোব আমাদিগকে দাসী করিয়া ফেলিয়াছে।

এরূপ প্রশ্নেব ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব উত্তর আব হইতে পাবেনা। কাহাবও ধর্ম্মমত পবিবর্ত্তনেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে ইহা বই আব উত্তব নাই যে, ভগবান্ আমাকে এইপথে আনিয়াছেন। বিদেশী সল্‌কে (সেণ্টপল্) জিজ্ঞাসা কব, থলিকা ও মবকে জিজ্ঞাসা কব, স্বদেশী প্রকাশানন্দকে জিজ্ঞাসা কব, আব বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা কর, অথবা বর্ত্তমান যুগেব বিবিধ সম্প্রদাযেব প্রকৃত ধর্ম্মার্থীদিগেব মত পবিবর্ত্তনেব কাবণ জিজ্ঞাসা কব, যিনি যে ভাষায় যেরূপভাবে উত্তব প্রদান করুন, প্রকৃত উত্তব একই, "ভগবান্ আমাবে এই থানে আনিযাছেন।"

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কবা, তাঁহাব বাক্য শ্রবণ কবা যেমন তোমাব নিকট বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য্য, একজন নিবীশ্বববাদীব নিকট তোমার ঈশ্বব-বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনা করা তদপেক্ষা অধিকতর বিকৃত মস্তিষ্কেব কার্য্য। স্নায়ু-শৃঙ্খলা (Nervous system) পরিত্যাগ কবিযা জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা যে থাকিতে পারে, তাহাব কিছু মাত্র প্রমাণ আছে কি? যদি বা অন্ধভাবে বিশ্বাস করিযা লওয়া যায যে, অবলম্বন-বিহীন ভাবে জ্ঞান অবস্থিতি কবিতে পাবে, তথাপি সেইরূপ জ্ঞান যে অবস্থিতি কবিতেছে, তাহার প্রমাণ আছে কি? যাঁহাবা সৃষ্টি-কৌশলেব মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব দেখাইতে ব্যস্ত, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে যদি কোন স্রষ্টা থাকেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিব অধিকাংশ ধারায় অভিযুক্ত করা যাইতে পাবে। বস্তুতঃ আস্তিক্য বুদ্ধির অভাব বশতঃ নাস্তিক যেরূপ ঈশ্বরেব অস্তিত্ব অস্বীকাব কবে, আস্তিক্য বুদ্ধির অত্যল্পতাবশতঃ তুমিও সেইরূপ বিশ্বাস কবিতে পারনা যে ঈশ্বব দেখা দেন, কথা বলেন, সকল বস্তুতে সকলরূপে প্রকাশিত হইতে পাবেন। তোমার অপেক্ষা যে ব্যক্তি কঠিন তার্কিক, তাহাকে তুমি নাস্তিক বল, এবং তোমাব অপেক্ষা যাহাব অস্তিক্য-বুদ্ধি অধিক, তাহাকে তুমি অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া থাক; ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা একান্তই গোড়ামী। অন্যেব ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে তুমি তর্কেব অস্ত্রে কাটিতে চাও এবং তোমার যুক্তিহীন মতগুলিকে তুমি বিশ্বাসের দোহাই দিযা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লও, কাজেই তোমার দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই তোমার গণ্ডীর বাহিবে যাইয়া পড়ে, এবং তোমাব মতের গণ্ডীব বাহিবে তুমি কিছুই দেখিতে পাওনা, এইজন্যই বিকাশের ক্রম বুঝিতে না পারিয়া তুমি বিকাশকে বিকার বলিয়া মনে কর।

এই প্রবন্ধে আমি কতকগুলি দৃষ্টান্তের ব্যবহাব করিয়াছি। এমন অনেক কুতার্কিক আছে, যাহাবা দৃষ্টান্তের দার্শনিক বিচারে

প্রবৃত্ত হইয়া বক্তব্য বিষয়ের গৌরব লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, দৃষ্টান্ত কখনও যুক্তি নয়, কোন সত্যকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত সত্যের সম্ভাবনা প্রকাশ করে এবং জটিল ও কঠিন বিষয়কে হৃদয়ে ধারণা করার সাহায্য করে মাত্র। সুতরাং দৃষ্টান্তে ভুল থাকিলেও লব্ধ সত্য মলিন হয় না। আমি বাষ্প ও মহুয়া বৃক্ষের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা লইয়া বিবিধ তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু আশা করি, আমি দেশবিদেশের মহাপুরুষগণের যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, আমার প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলিতে ত্রুটী থাকলেও সে সকল উক্তির সত্যতা মলিন হইবেনা।

আর একটী কথা এই যে,অনেকে দৃষ্টান্তকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে চাহেন, দৃষ্টান্তের কোন্ অংশটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ভাবিয়া দেখুন, "চন্দ্রবদন" বলিলে কেহ যদি চন্দ্রের মতন গোলাকার এবং বৃহৎ কলঙ্ক বিশিষ্ট চক্ষু-কর্ণ নাসিকা-বিহীন একখানি উজ্জ্বল চেপ্‌টামুখ বুঝিয়া লয়েন, তবে চন্দ্রবদন খানি কিরূপ কদর্য্যবদন হইয়া দাঁড়ায়। আশা করি, আমার এই প্রবন্ধের পাঠক পাঠিকাগণ আমার প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলিকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে দেখিবেন না। আমি যে সকল সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, সেই সকলের প্রতিই দৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা।

জন্মান্তর ও কর্ম্ম।*

মানুষের আধখানা পশু, আধখানা দেবতা। আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াগুলিতে মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ নাই। মানুষ যত দিন জড় শরীরটা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, ততদিন তার ভিতরে যে দেবতা আছেন, তাঁর সন্ধানই সে পায় না। ক্রমে যখন তাঁর সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে, তখন স্বভাবতঃই কতকগুলি প্রশ্ন তাহার মনে উদিত হয়,—আমি কে? কেন এখানে আসিলাম? কে আমাকে এখানে আনিল? যদি আসি-লামই, তবে এ জীবনটা লইয়া কি করিব? এ দেশের ঋষিগণ এ প্রশ্নগুলির যে উত্তর দিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম এই—আমাতে ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই, আমিই ব্রহ্ম। যতদিন আমি মায়াবদ্ধ, ততদিন এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে না, এবং ব্রহ্মোপলব্ধিও হইবে না। তত দিন কর্ম্মফল-ভোগের জন্য বারম্বার এখানে আসিতে হইবে। আমার কর্ম্মই আমাকে এখানে আনিয়াছে। জীব-নের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা। কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইলেই আর সংসারে আসিতে হইবে না। কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিই একমাত্র সুখ।

* "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বরিশাল শাখা"র প্রথম বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত। সম্পাদক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে যতগুলি দর্শন প্রচলিত আছে, তার সকলগুলির মূলেই দুঃখবাদ। এ জগৎ দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, সংসারের প্রত্যেক অলি গলিতে দুঃখ। বৌদ্ধ আখ্যায়িকার রূপকে দেখিতে পাই, শাক্যসিংহ জীবন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সকলকেই দেখিলেন। তখন যিনি জীবন-পথের সারথি, যে নারায়ণ সংসার-কুরুক্ষেত্রে নরের সারথি, যিনি শাক্যসিংহের সারথি, সকলেরই সারথি,—সেই সারথিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কোন্ পথে আনিলে সারথি, এ যে মৃত্যুর পথ, ব্যাধির পথ, জরার পথ। এ পথে যে কেবলই অশ্রুজল, কেবলই হাহাকার, কেবলই দুঃখ। এ যে দুঃখের পথ। সারথি বলিলেন, রাজকুমার, এ যে সংসারেরই পথ। এ পথে ত সকলকেই এসব ব্যাপার দেখিতে হয়, ভুগিতে হয়। শাক্যসিংহ সারথিকে বলিলেন, পুরীর দিকে রথ ফিরাও। সংসারের অধিকাংশ লোকই সারথিকে বলে, বাহিরের দিকে রথ চালাও। থাকুক না জরা, থাকুক না ব্যাধি, থাকুক না মৃত্যু, রথ চালাও। সকলই ত জরা ব্যাধি মৃত্যু নয়। যৌবন আছে, স্বাস্থ্য আছে, জীবন আছে, সুখওত আছে, রথ চালাও। গোলাপ তুলিতে গেলে কাঁটাও ফোটে, পদ্ম বনে বিষধর ভুজঙ্গও থাকে, তা বলে, কি গোলাপ তুলিব না, পদ্ম তুলিব না? মৌমাছির ভয়ে কি মধু আহরণ করিব না? থাকুক না জরা মৃত্যু, থাকুক না দুঃখ, রথ চালাও। যত টুকু সুখ আছে, তাই ভোগ করা যাবে। দুঃখের দিকে নজরটা না দিলেই চলিবে। থাকুকনা মেঘে বজ্র, অমৃতধারাওত আছে। বর্ত্তমান ইউরোপ ঠিক্ এই কথাটাই বলেন। ইউরোপ বলেন, খুব বাহিরের দিকে রথ চালাও। যদি পথের পাশে শব থাকে তবে সেটাকে কিছু দিয়া ঢাকিয়া রাখ, যেন চখে না পড়ে। যদি কেহ ব্যাধিগ্রস্ত বা জরাগ্রস্ত থাকে, তবে তাকে সুন্দর বেশ ভূষায় সুশোভিত কর, সে যেন কিছুতেই স্বীকার করেনা যে, সে ব্যাধিগ্রস্ত বা জরাগ্রস্ত। বন্ধুগণ তাকে দেখিয়া বলুক যে মুখে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফুটিয়া পড়িতেছে। আর যদি একবারে অচল হয়, তবে সংসারের পথের বাহিরে ভালবাসার জনের অগোচরে, মাতা, ভগিনী, পত্নী, কন্যার চক্ষের আড়ালে, আরও ঐ রূপ কতকগুলি মুমূর্ষু ব্যক্তির সঙ্গে তাকে একটা আলাদা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ। সংসারে দুঃখ আছে, থাকুক, কিন্তু সংসারের সুখটুকু কেন ভোগ করিব না? দুঃখটাকে চাপা দিলেই ত হয়।

প্রাচীন ঋষিও একথাটা বিলক্ষণ ভাবিয়াছিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, যে সুখ দুঃখ-মিশ্রিত, সে সুখ অখণ্ড সুখ নহে, যে সুখ অল্প, যে সুখের শেষ আছে, সে সুখ মানুষের স্পৃহণীয় হইতে পারে না। তাহা সুখই নহে। "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" এ দেশের সকল গুলি দর্শনই এই কথা বলে। তাহাদের আরম্ভ দুঃখবাদে। সমাপ্তি সর্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে। সর্ব্ব দুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, যে নিবৃত্তিতে দুঃখের লেশ মাত্র থাকে না, যে অবস্থায় তাহা লাভ হয়, তাহার নাম দিয়াছেন তাঁহারা মুক্তি—সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি, কর্ম্ম পাশ হইতে মুক্তি। তাহারই অপর নাম মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ। এ মুক্তিলাভ হঠাৎ হয়

না। বহুবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, বহু-সাধনা করিতে হয়। তবে মোক্ষ রূপ সিদ্ধি লাভ হয়। কিরূপে জীবের দুঃখ নাশ ও মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তাহাই সকল দর্শনের আলোচ্য বিষয়।

বর্ত্তমান ইউরোপ ও ইউরোপ-শিষ্যদেরও প্রধান আলোচ্য বিষয় জীবের দুঃখ নাশ। কিন্তু দুঃখনাশ কথাটা ভারতের ঋষিগণ যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপ সে ভাবে বোঝেন নাই। সুখের অন্বেষণে ঋষিগণ শাক্যসিংহেরই মত সংসারের পথ হইতে রথ ফিরাইয়া পুরীর দিকে প্রবেশ করিলেন—অন্তর্মুখীন হইলেন। ইউরোপ সেই একই উদ্দেশ্যে বহির্মুখীন হইলেন। ভারতবর্ষ সুখ খুঁজিয়াছিলেন ভিতরে, ইউরোপ সুখ খুঁজিয়াছেন বাহিরে। ইউরোপ এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বাহিরের পথ সুখের পথ নয়। পর্ব্বত প্রমাণ ধন, সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য, জগৎযোড়া বাণিজ্য, সাগরজোড়া যুদ্ধ জাহাজের বহর—এ সকল জীবকে সুখী করিতে পারে না। অনেকে ঠেকিয়া শিখিয়া এখন পুরীর দিকে প্রবেশের পথ খুঁজিতেছেন। শাস্ত্রে দেহের এক নাম ব্রহ্মপুর। ব্রহ্ম কিম্বা আত্মাকে পুরুষও বলা হয়। শঙ্করাচার্য্য পুরুষের নিরুক্ত করিয়াছেন "পুরিশেতে যঃ স পুরুষঃ।" । যে ব্রহ্ম পুরীর ভিতর আছেন, তিনিই পুরুষ, তিনি আনন্দঘন। সেখানে গেলে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। কিরূপে সে পুরীর ভিতর যাইতে হয়, কিরূপে অখণ্ড সুখের সন্ধান লইতে হয়, ভারতের দর্শনগুলিতে তার প্রণালী বর্ণিত আছে। যাঁহারা সে পথের পথিক, তাঁহারা বলিতে পারেন, সে পথের চরম কোথায়। যাঁহারা অল্প পরিমাণেও সেদিকে অগ্রসর, তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি যে, সে পথ অনন্ত অখণ্ড সুখের রাজ্যে গিয়া মিশিয়াছে।

সকলগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন যাহা এক-বাক্যে নির্দ্ধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, সেই জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে দুই একটা কথা বলাই আমার অভিপ্রেত। আনুষঙ্গিক ভাবে কর্ম্মবাদ সম্বন্ধেও কিছুকিছু আলোচনা করিতে হইবে। বিষয়টা গুরু-তর। একটু পাকা হাতে পড়িলেই ভাল হইত। বন্ধুবর্গের মধ্যে আলোচনা করি-তেছি, এই আমার ভরসা।

জন্ম এবং কর্ম্ম ভারতীয় সকল দর্শনেরই মূল ভিত্তি। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই ঋষি-সমাজে এই দুইটা বিষয় আবিষ্কৃত ধ্রুব সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। জন্মান্তর ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে এদেশে কোন পণ্ডিতই সন্দি-হান হন নাই, কারণ, তাঁহাদের কাছে এ দুইটা কথা প্রামাণিক সত্য। বুদ্ধদেবও তাহা নির্ব্বিচারেই গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ প্রমা-ণিত সত্যের পুনর্ব্বিচার পণ্ডশ্রম মাত্র। বিশে-ষতঃ বুদ্ধদেবের মত নবদেবতাদিগের পক্ষে ইহা বোধ হয় প্রত্যক্ষের বিষয়। কেবল যে ভারতবর্ষের পণ্ডিতদিগের কাছেই জন্মান্তর-বাদ ধ্রুব সত্যরূপে আদরণীয় হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাচীনকালে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাচীন মিশ্রদেশে ভারতবর্ষেরই মত পণ্ডিত মূর্খ সকলেই জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন। আমেরিকার অতি প্রাচীন জাতি,—যাহাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত বংশধরদিগকে স্পেনিয়ার্ডগণ অতি নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করিয়া নূতন-মহাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, মিশ্রদেশের পিরামিড্ যখন নির্ম্মিত হয় নাই, পৃথিবীর

সেই শৈশবকালে যাহারা সভ্যতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সব জাতি জন্মান্তরে দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন এবং আজও তাঁহাদের হীনাবস্থ বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বিশ্বাস পোষণ করিতেছে। গ্রীসদেশের বহু পণ্ডিত ইহাতে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহুদিদের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের বহুস্থানে এই মতের সমর্থক কথা আছে। Neo-Platonist দার্শনিকগণ হিন্দুদের মতই ইহাতে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। Gnostic খ্রীষ্টানগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন এবং এইমত তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল। প্রাচীন খ্রীষ্টান ফাদারগণের ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। যদিও বর্ত্তমান সময়ে গোড়া খ্রীষ্টানগণ এ বিষয়ে অবিশ্বাসী, তথাপি নিউ টেষ্টামেণ্টের মধ্যেই এমন সকল কথা আছে, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যীশুখ্রীষ্টের সময় প্যালেসটাইনের জনসাধারণ এইমতে বিশ্বাস করিত। তাহারা John the Baptist কে মনে করিত যে, ইনি সেই পুরাকালের প্রফেট ইলাইজা, পুনরায় ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্য একস্থলে শিষ্যগণ যীশুকে কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভো, এ ব্যক্তি কি পিতামাতার পাপে অন্ধ হইয়াছে, না নিজের পাপেই জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে?" প্রশ্নকারী যদি জন্মান্তরে অবিশ্বাসী হইতেন, তবে এই প্রশ্নের শেষাংশের কোন অর্থই থাকিত না, কারণ, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আর কোথায় সে পাপাচরণের অবসর পাইল? মধ্যযুগের ইউরোপে Paracelsus, Swedenborg, Giordano Bruno, Camparella প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মান দার্শনিক Schopenhauer, Lessing, Hegel, Leibnitz, Herder, Fichte the younger প্রভৃতি এই মতে বিশ্বাসবান্। ইউরোপ ও আমেরিকায় অদ্যও অনেক চিন্তাশীল নরনারী জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এদেশের মাঠের কৃষক হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই জন্মান্তর এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাসী। অমুক এমন সৎলোক, তাহার কেন পুত্রশোক হইল? পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতবড় চতুর ও সতর্ক ব্যবসায়ীর কেন বাণিজ্যে ক্ষতি হইল?—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। জীবনের যত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, যাহার কোন পরিষ্কার কারণ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না, যাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা, তাহাই এ দেশের লোকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের উপর আরোপ করে। মূর্খেও করে, পণ্ডিতেও করে। এ বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল? ইহা বহু যুগযুগান্তরগত শিক্ষার ও উপদেশের গভীর ছাপ। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে এমন এক দিন ছিল, যখন জীবের উৎক্রান্তি, অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোক গতি ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শিক্ষা এ দেশে সর্ব্বশিক্ষার শেষ শিক্ষারূপে গণ্য হইত। এই বিদ্যার নাম ছিল, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। ইহা পরম গুহ্যরহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাকে তাকে ঋষিগণ এ বিদ্যা শিখাইতেন না। এ বিদ্যা শিক্ষার অধিকারী হইতেও বহু সাধনার আবশ্যক হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার কথা আছে। তিনিও জনক রাজার মত ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আরুণী শ্বেতকেতু যখন পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলেন, প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে বলিলেন "কুমার, তোমার পিতা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন কি?" শ্বেত-

কেতু বলিলেন "হাঁ মহাশয়।" তখন প্রবাহণ জৈবলি তাহাকে একে একে জীবের উৎক্রান্তি, দেবযান, পিতৃযান ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বেতকেতু প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "না মহাশয়, আমি জানিনা।" তখন জৈবলি কহিলেন "যদি এ সকল তত্ত্ব না জান, তবে কেমন করিয়া বলিলে যে তুমি শিক্ষিত হইয়াছ?" শ্বেতকেতু মহা লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন "সে ক্ষত্রিয় বন্ধু আমাকে পর পর পাঁচটী প্রশ্নের উত্তর করিল। আমি একটীরও উত্তর দিতে পারিলাম না। আপনি আমাকে কেমন শিক্ষিত করিয়াছেন?" পিতা বলিলেন "এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমিও জানি না। যদি জানিতাম, তবে কি তোমাকে না বলিতাম?" তারপর পিতা পুত্র প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন এবং এই গুহ্য বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। যথাকালে প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাদিগকে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপদেশ করিলেন। উপদেশান্তে বিদ্যার স্তুতি করিয়া বলিলেন "যিনি এই পঞ্চ অগ্নি জ্ঞাত হন, তিনি পতিতের সহিত সহবাসেও পাপ লিপ্ত হন না। যিনি এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা লাভ করেন, তিনি শুদ্ধ, তিনি পূত, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন।"

এতএব দেখা গেল যে, সুদূর অতীত, যে অতীতের পশ্চাতে মানব চিন্তার আর কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না,—সেই অতীত কাল হইতে এ দেশের ও অন্যান্য কোন কোন দেশের আপণ্ডিত মূর্খ সকলেই জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। জগতের নানা দেশে ও নানা কালে বহু পুরাতন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক পণ্ডিত এবং অনেক মহামহোপাধ্যায় দার্শনিকগণ এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ভারতে শুধু চার্ব্বাক মতাবলম্বী দেহাত্মবাদীগণ জন্মান্তর মানিতেন না, কারণ, তাঁহাদের মতে দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই, চেতনা জড়েরই কার্য্য, এবং ভস্মীভূত জড় দেহের পুনরাগমন অসম্ভব। আর বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং অন্য কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী, সুতরাং এ বিষয়ে পুনরালোচনা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনার প্রারম্ভে মাত্র এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, যে মতে বহু প্রাচীন কাল হইতে এত গুলি দার্শনিক পণ্ডিত বিশ্বাসবান্, যে মত বুদ্ধ, জীন্‌মহাবীর, শঙ্কর, রামানুজ ও উপনিষদের ঋষিগণ ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, যে মতের অন্তর্নিহিত সত্যের আকর্ষণে বহু পাশ্চাত্য-দার্শনিক আজও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ, সে মতটাকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। গোঁড়ামিতে তাহাও পারা যায়, কিন্তু গোঁড়ামি ত অন্ধতা। তবে কিনা, একটা কথা অনেক লোকে এবং বহু লোকে বিশ্বাস করিয়াছেন, সুতরাং নিরাপত্তিতে আমাদের সকলকেই তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে, একথা আমি মোটেই বলি না। সকল শাব্দ প্রমাণ সম্বন্ধেই একথা খাটে। মহাজন বাক্যে অশ্রদ্ধা করা ধৃষ্টতার কার্য্য। আমরা অশ্রদ্ধা করিতেছিনা, কিন্তু শিক্ষার্থীর ন্যায় বিষয়টা একটু বিচার করিয়া দেখিতে দোষ কি? এইরূপ বিচার করাওত মহাজনদিগেরই উপদেশ। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্বেষণ করা বৃথা, কারণ জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়, কি না হয়, তার প্রমাণ কেমন করিয়া